আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালায় ১ম গ্রন্থ।

মোতি-কুমারী

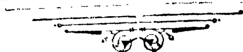
অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

কার্ত্তিক,—১৩২৪

প্রকাশক—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মুখার্জ্জি বসু এণ্ড কোং
কর্ণওয়ালিশ বিল্ডীংস,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস,
মেট্‌কাফ্‌ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌,
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

উপহার পৃষ্ঠা



নিবেদন

গত ১৬ই আশ্বিন, মঙ্গলবার—কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। আমি শুধু তাঁহার পুস্তক প্রকাশক নহি,—আমি তাঁহার প্রতিবেশী; অতি বালক কাল হইতে তিনি আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, যত্ন করিতেন, উপদেশ দিতেন; আমিও তাঁহাকে পিতৃতুল্য ভক্তি করিতাম, শ্রদ্ধা করিতাম, তাঁহার উপদেশ লাভে ধন্য হইতাম। তিনি আমাদের একজন প্রধান অভিভাবক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু এতই আকস্মিক যে, দুই দিন পূর্ব্বেও আমরা কেহই বুঝিতে পারি নাই।

মৃত্যুর পূর্ব্বে রবিবারে আমার কথামত তাঁহার পুত্র বন্ধুবর অজয়চন্দ্র এই পুস্তক-প্রকাশ-সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। সেদিন তিনি বেশ ভালই ছিলেন। উত্তরে তিনি তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং 'মোতি-কুমারী' ভিন্ন অন্য কোন্ কোন্ রচনা এই পুস্তকে সন্নি-বেশিত করিতে হইবে, তাহাও বলিয়া দেন। পরদিন 'প্রবাসীতে' ও 'ভারতবর্ষে' আমরা বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া দিলাম। সে এক মহা আনন্দ! শারদীয়া পূজার প্রারম্ভে

আমরা নূতন ব্রতে ব্রতী হইলাম—আট আনা সংস্করণ বাহির করি, আর সেই সংস্করণের প্রথম পুস্তক বঙ্গের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ মনীষীর রচিত—বাস্তবিকই আনন্দ আর ধরে না! তাহার পর, এক দিনের মধ্যে আজন্ম সাহিত্য-সাধক তাঁহার সাহিত্য সাধনা শেষ করিয়া মহা সাধনার পথে চলিয়া গেলেন; আমরা দারুণ শোকে মুহ্যমান হইলাম। কিন্তু এই শোকের সময়েও তাঁহার সেই পুরাতন রচনাগুলি—ব্যঙ্গে উজ্জ্বল, হাস্যে মধুর, গাম্ভীর্য্যে গভীর, রসে ভোরপূর, আন্তরিকতায় টলটল—সেই অমূল্য রত্নগুলি নাড়াচাড়া করিয়া, পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া মনে যেন কতকটা শান্তি পাইলাম।

'মোতি-কুমারী' ১৩১৫ সালের 'পূর্ণিমা' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র গল্পের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

"এমন ঘোর স্বদেশীর দিনে একটী নিতান্ত বিদেশী গল্প, বিদেশীর লেখা গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া তোমাদিগকে উপহার দিব। তাহাতে তোমাদের লাভ আছে। আমি দেখিয়াছি, তোমরা স্বদেশী গল্প পড়িতে পড়িতে ভাবনা কর—'এটা কা'র উপর হইল? গ্রন্থকার কা'র উপর আক্রমণ করিলেন?' আমার এ লেখায় সেরূপ কিছু ভাবিবার অবসর পাইবে না,—কেন না পূর্ব্বেই বলিয়াছি

এটী সম্পূর্ণ বিদেশী। মাথা ঘামাইয়া আক্রমণের লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে না, এই হইল তোমাদের লাভ। আর আমারও লাভ বড় কম নহে,—আমাকে এই বাঙ্গালার ভাগীরথীর উপর বিরাট পাথুরে কেল্লা সৃষ্টি করিতে হইবে না, ঔরঙ্গজেবের অন্তঃপুরে তাড়িৎ আলোক সাজাইতে হইবে না, রাধা গোয়ালার গুণগ্রাম বঙ্গকুমারীতে সন্নিবেশিত করিতে হইবে না। বিদেশীদের কথা বিদেশী যেমন বলিয়াছেন, আমি প্রায় ঠিক সেইরূপ ভাবেই বলিব। Haggard সাহেবের 'Pearl maiden' হইতে গল্পটী সঙ্কলিত।"

'বদ্‌রসিক,' 'কুঞ্জ সরকার' ও 'সুন্দরবনে ব্যাঘ্রাধিকার' —'নবজীবনের' প্রথম বর্ষে, ১২৯১ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'হলধর ঘটক' 'নবজীবনের' দ্বিতীয় বর্ষে এবং 'পূজার গল্প' তৃতীয় বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'মশক' চতুর্থ বর্ষের 'বঙ্গদর্শনে' ১২৮২ সালে প্রকাশিত হয়।

আজকাল রসের কথা ভাগ করিয়া বুঝাইয়া না দিলে কেহ বুঝিতেই পারেন না। হলধর ঘটক ও কুঞ্জ সরকার যে কোন দিনই মর্ত্তাভূমি পবিত্র বা মলিন করেন নাই, এ কথা ভূমিকায় না লিখিলে চলিবে কি? তাঁহারা যে শুধুই রসের মূর্ত্তি—ব্যক্তিবিশেষ নহেন, এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিবার একটু তাৎপর্য্য আছে। রামপ্রসাদ ও আজু

গোঁসাইএর আদর্শে সরকার মহাশয় 'নবজীবনে' 'দিগম্বর ভট্টাচার্য্য' নামে একটী 'প্রবন্ধ লেখেন—দিগম্বর ভট্টাচার্য্য যেন রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ব্যক্তি, তিনি যেন রাজার ব্রহ্মসঙ্গীতের পাল্‌টা জবাব দিয়াছিলেন। বিড়ম্বনা দেখুন—'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বাঙ্গালার গানে' দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের জীবন-চরিত ও গান ছাপা হইয়া গেল!

'পূজার গল্প' একত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রচিত ছোট গল্প। বলিতে গেলে ইহার পূর্ব্বে ছোট গল্প আর প্রকাশিত হয় নাই। এই এত দিনের আগের লেখা হইলেও এই গল্পটীতে ছোট গল্পের সমস্ত গুণই সকল বিশেষত্বই পূরা মাত্রায় বর্ত্তমান—এ কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। ইহাকে ছোট গল্পের আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কমলাকান্তের দপ্তরে আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র দুইটী রচনা দিয়াছিলেন,—একটী 'চন্দ্রালোকে' বঙ্কিমচন্দ্রের দপ্তরে প্রকাশিত হইয়াছে, দ্বিতীয়টী 'মশক' আমরা আজ প্রকাশ করিলাম।

আমরা আট আনা সংস্করণের প্রথম গ্রন্থে তাঁহার লঘু ও সরস রচনার কতকগুলি প্রকাশ করিলাম। ভরসা —শ্রীভগবান্, সম্বল—সহৃদয় পাঠকবর্গের অনুকম্পা। পাঠক-বর্গের অনুগ্রহে আমরা সফলতা লাভ করিলে ভবিষ্যতে

তাঁহার অন্য বিবিধ রচনাগুলি প্রকাশ করিয়া ধন্য হইব। মনে বড় দুঃখ রহিল 'মোতি-কুমারী' তাঁহার হাতে দিতে পারিলাম না।

শ্রী৺ মহাষষ্ঠী
৪ঠা কার্ত্তিক
১৩২৪।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
প্রকাশক।

সূচি

মোতি-কুমারী

উনিশশো বৎসর পূর্ব্বে য়ুদীদেশে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হয়—এ কথা সকলেই জানেন। কিছুকাল ধর্ম্মোপদেশ দিয়া শত্রুহস্তে মহা লাঞ্ছিত হইয়া, যীশু স্বর্গগমন করেন। সেই সময়ের সেই দেশের একটী গল্প বলিব। য়ুদী জাতি তখন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অতি অল্পসংখ্যক যীশুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসবান্; নবধর্ম্মের নববলে তাহারা বলীয়ান্। কিন্তু অধিক সংখ্যক য়ুদী যীশুকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিত না, তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া জানিত এবং নব সম্প্রদায়ের স্বজাতিকে স্বধর্ম্মত্যাগী মূঢ় বলিয়া ঘৃণা করিত, লাঞ্ছনা করিত, যন্ত্রণা দিত। রোম রাজ্যের এবং রোম্যানদের তখন প্রবল প্রতাপ। সেই প্রতাপে রোম্যানরা তখন মহা দর্পিত, য়ুদী জাতিকে উৎসন্ন দিবার জন্য রোম তখন বদ্ধপরিকর হইয়াছে। কেবল য়ুদী জাতি বলিয়া নয়, রোম স্বীয় অসীম সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিকস্থ সভ্য অসভ্য সকল জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করিতেছে, তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে, তাহাদের দেশ উৎসন্ন দিতেছে। তৎকালে য়ুদী-

ভূমিতে স্ত্রীপুত্রবিহীন ঈষানী নামে একটী ক্ষুদ্র সন্ন্যাসি-সমাজ ছিল। তাহারা চাষবাস করিত, আতিথ্য করিত, ভগবানের ভজনা করিত,—কিন্তু বিবাহ করিত না, কোন নারীর মুখ দেখিত না, কোন স্ত্রীলোক অতিথি হইলে মুখ ফিরাইয়া তাহার সহিত কথা কহিত কিন্তু অতিথিশালায় তাহাদিগকে স্থান দিত, আহার দিত, রক্ষা করিত। এই ক্ষুদ্র নিরীহ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ও রোমের প্রতাপে বিকম্পিত ছিল।

নিকটস্থ ফিনিসিয়া দেশের টায়র নগরে বেনোনি নামে একজন মহা ধনবান্ য়ুদী বণিক্ বাস করিতেন। তাঁহার র‍্যাচেল নামে এক কন্যা ছিল। সিরিয়া দেশের গ্রীক-বংশজ ডিমাস্ নামক এক যুবকের সহিত তাহার বিবাহ হয়। ডিমাস্ ও র‍্যাচেল উভয়েই নবধর্ম্ম অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং সেই জন্য বেনোনির বিষনয়নে পড়েন। বেনোনির চক্রান্তে জামাতা ডিমাস্ রোম্যান-প্রতাপের পেষণে প্রাণে নষ্ট হইল। রোমের সম্ভ্রান্ত লোকেরা—এমন কি সম্রাটেরাও বন হইতে সদ্যোধৃত সিংহ-শার্দ্দূলের সহিত নিরাশ্রয় নিরস্ত্র মনুষ্যের সংগ্রাম দেখিতেন। সিংহ-ব্যাঘ্রে নিরুপায় মনুষ্যকে ফাড়া ছেঁড়া করিয়া ভক্ষণ করিত। সমবেত সহস্র সহস্র লোকে সেই ভয়ানক নৃশংস দৃশ্য মহা

আনন্দে দর্শন করিত, হো হো করিয়া হাস্য করিত, চট্ চট্ করিয়া করতালি দিত।—অতিগর্ব্বে হতা লঙ্কা—সে রোম আর অবশ্য নাই; রোম্যান জাতি জগৎ হইতে বহু দিন বিলুপ্ত হইয়াছে।

এইরূপে ডিম্যাসের প্রাণ নষ্ট হয়। তখন র্যাচেল গর্ভবতী ছিলেন। শত শত য়ুদী য়ুদানীর সঙ্গে র্যাচেলকে এইরূপে বধ্যভূমি বা ক্রীড়াভূমিতে আনা হইল। সিরিয়া দেশীয়া সম্ভ্রান্ত আরব জাতীয়া প্রভুপরায়ণা একটা দাসী র্যাচেলের সঙ্গ লইয়াছিল। সেও খ্রীষ্টান কিন্তু আরবের অধ্যবসায় তাহার রক্তে ছিল। সে র্যাচেলকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল; প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল নিজের প্রাণ দিয়াও অপরের প্রাণ লইয়াও র্যাচেলকে রক্ষা করিবে। সে স্বীয় বসন-মধ্যে বিমলার মত শাণিত অস্ত্র লইয়াছিল। তাহার নাম নেহুস্তা।

রোমের কৈশরের অধীনে আগৃপা তখন ঐ দেশের রাজা। সেই বিস্তীর্ণ ক্রীড়াভূমি বা বধ্যভূমির প্রাঙ্গণ-পার্শ্বস্থ সমুজ্জ্বল সিংহাসনে আগৃপা যেমন উপবেশন করিলেন, অমনি তিনি মহা বেদনায় ব্যথিত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। নকিব্ তখন ফুকরিয়া বলিয়া দিল, সেই দিন আর ক্রীড়া হইবে না,—রাজা পীড়িত। দর্শকমণ্ডলী মহা বিক্ষুব্ধ হইয়া

অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল। নেহুস্তা সুযোগ পাইয়া একজন প্রহরীকে হত্যা করিয়া, একটী গুপ্ত দ্বার দিয়া দুর্গমধ্য হইতে গোলেমালে র‍্যাচেলকে লইয়া পলায়ন করিল : পলায়ন করিয়া একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে গমের গোলা ছিল, সেইখানে দুই জনে লুকাইয়া রহিল। সেই গোলার অধিকারী আম্‌রাম নামক একজন মহাজন। তাহাকে সেই প্রহরী-মারা-ছুরীর ভয় দেখাইয়া র‍্যাচেলের উদ্ধার সাধন করিল। নেহুস্তা ও র‍্যাচেল জাহাজে চড়িয়া মিসর যাত্রা করিল। মহা ঝঞ্ঝাবাতে সমুদ্রগর্ভস্থ শিলায় লাগিয়া জাহাজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। নাবিকেরা কেহ নৌকা-যোগে পলায়ন করিল, কেহ সমুদ্রগর্ভে প্রাণত্যাগ করিল। ভাঙ্গা জাহাজে চড়ার উপর র‍্যাচেল একটী কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন ; নেহুস্তাকে বলিলেন, "এই কন্যার নাম রাখিলাম মিরিয়্যাম্। এটী খ্রীষ্টান কন্যা—খ্রীষ্টান হইল। খ্রীষ্টান ধর্ম্মে ইহাকে প্রতিপালন করিও ; খ্রীষ্টান ভিন্ন অন্য কোন বরের সহিত বিবাহ দিও না। আমার অঙ্গের সঙ্কেত-কবচ আমার মামা আইথিয়্যালকে দেখাইলে তিনি ইহার প্রতিপালনের ভার লইবেন। তিনি সন্ন্যাসিক্ষেত্রেই থাকেন। নেহুস্তা, তুমি আমাকে যেরূপ প্রতিপালন করিয়াছ, ইহাকেও সেইরূপ করিও।" ভগবানের নাম করিতে

করিতে র‍্যাচেলের মৃত্যু হইল। তাঁহার সদ্গতি লাভ হইল। মৃতদেহ ভাঙ্গা জাহাজে রাখিয়া, জাহাজে আগুন লাগাইয়া দিয়া, মৃতের ভীষণ সৎকার করিয়া, সদ্যোজাত মিরিয়াম্‌কে ক্রোড়ে করিয়া শৈলময়ী বেলাভূমি ছাড়াইয়া নেহ্‌স্তা নিকটস্থ গ্রাম অভিমুখে গেল। তাহার সঙ্গে কিছু অর্থ ছিল, র‍্যাচেলও কিছু দিয়াছিল, দহ্যমান্‌ জাহাজ হইতেও কিছু সংগ্রহ করিয়াছিল। গ্রামে গিয়া একটী মৃতবৎসা দুগ্ধবতী রমণীকে রক্ষিকারূপে ও তাহার স্বামীকে রক্ষকরূপে সামান্য অর্থদানে নিযুক্ত করিয়া সেই সন্ন্যাসভূমির দিকে চলিল।

সন্ন্যাসক্ষেত্র একরূপ আনন্দ-মঠ; তবে আনন্দ-কাননে বিদ্রোহীর দল থাকিত, সন্ন্যাসক্ষেত্রে নিরীহ ধর্ম্মপরায়ণ কৃষকমণ্ডলী বাস করিত। নিরীহ বলিতে নির্জীব কুঞ্জের জীব নহে। ইহারা বলিষ্ঠ, বীর্য্যবান্‌, তেজস্বী, কর্ম্মপরায়ণ, শ্রমকষ্টসহিষ্ণু, অধ্যবসায়শীল, আত্মরক্ষায় পটু; সকলে একমত হইয়া কাজ করে, আপনারা চারি পাঁচ সহস্র হইলেও নির্দ্দিষ্ট শতসংখ্যক বয়োবৃদ্ধের পরামর্শ মত কার্য্য করে, গান শিক্ষা করে, বাণ শিক্ষা করে, ভাস্কর্য্য, তক্ষণ সকলি শিক্ষা করে। আর সকল কার্য্যই ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া করে।

আইথিয়্যাল সন্ন্যাসক্ষেত্রের নিকটস্থ মালভূমিতে কর্ষণ করিতেছিলেন। মিরিয়্যামের নবরক্ষক তাঁহাকে গিয়া সংবাদ দিল যে, একটী নবপ্রসূতা কুমারী লইয়া একজন বর্ষীয়সী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে। আইথিয়্যাল হাল-বলদ রাখিয়া কৃষকের সঙ্গে গেলেন, মুখ ফিরাইয়া নেহুস্তার সহিত কথা কহিলেন। সঙ্কেত-কবচাদি দেখিয়া তাহার সকল কথা বিশ্বাস করিলেন। তাহাদিগকে সেই স্থানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিতে বলিয়া রক্ষককে সঙ্গে লইয়া গ্রামে গেলেন। কিছু খাদ্য ও পেয় তাহার হস্তে পাঠাইয়া দিলেন। আইথিয়্যালের প্রার্থনা মত বিস্তীর্ণ সভাগৃহে শত বৃদ্ধ সমবেত হইলেন। আইথিয়্যাল তাঁহার ভাগিনেয়ীর ও ভাগিনেয়ী-পুত্রীর সমস্ত বিবরণ সভাসমক্ষে বিবৃত করিলেন; কি করা কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসু হইলেন। সন্ন্যাসীর সভায় ঘোর তর্ক বিতর্ক হইল। শেষে স্থির হইল, আশ্রিত-প্রতিপালনের অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই সুতরাং বর্ষীয়সী দাসী এবং নবপ্রসূতা কুমারীকে প্রতিপালন করিতেই হইবে। অতিথিশালার এক ভাগে একটী ক্ষুদ্র উদ্যান-পরিবেষ্টিত প্রকোষ্ঠে তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, অন্ন-বস্ত্রাদি তাহারা যথোপযুক্ত পাইবে, কন্যাটীকে বিবাহকাল পর্য্যন্ত উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে। খ্রীষ্টান

সৎপাত্রে বিবাহ দিয়া অথবা বিবাহকাল উত্তীর্ণ হইলে, তাহাকে নিরাপদ্ স্থানে রাখিয়া ঈষানী সম্প্রদায় কুমারীর এবং কুমারীর প্রাচীনা রক্ষিকার চিরজীবনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিবেন। আপাততঃ কিছু কালের জন্য দুগ্ধবতী ধাত্রীও থাকিল। এইরূপে মিরিয়াম্ সহস্র সন্ন্যাসীর হৃদয়সিংহাসনে অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে অধিষ্ঠিত হইলেন।

(২)

ঐ সময়ে হিলিয়্যাল নামে একজন সম্ভ্রান্ত য়ুদী ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে রোম্যানদিগের পক্ষ অবলম্বন করিতেন বটে কিন্তু সেই জন্যই রোম্যানরা তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া হত্যা করে এবং তাঁহার প্রভূত ধন-সর্ব্বস্ব অধিকার করিয়া লয়। তৎপূর্ব্বেই হিলিয়্যাল-পত্নীর মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং হিলিয়্যালের একমাত্র পুত্র ক্যালেব শৈশবে নিরাশ্রয় ও নিঃস্ব হইয়া পড়িল। সন্ন্যাসীরা তাহাকেও আশ্রয় দিল ও প্রতিপালন করিতে লাগিল। মিরিয়্যাম্ কেবল এক পাল অশীতিপর বৃদ্ধ লোকেরই সহিত বাস করিত, এক জন সমবয়সী পাইয়া আহ্লাদে আটখানা হইল। তাহারা দুই জনে কত খেলাই খেলিতে লাগিল। ক্যালেব বড় সুন্দর ছেলে, কাল কাল চোক, আর কাল কাল কোঁকড়া

কোঁকড়া চুল কাঁধে ঝল্ ঝল্ করিতেছে। একটু রাগিলে চোক দিয়া যেন আগুনের ফিন্‌কি বাহির হয়। যা ধরে তা ছাড়ে না, যা ছাড়ে তা আর ধরে না। ছেলেটীকে নেহুস্তার কিন্তু ভাল লাগিল না। কাল মাগী নেহুস্তাকেও তাহার কেমন কেমন লাগিল। মিরিয়্যাম্ ক্যালেবকে ভালবাসিত কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুরদের বা নেহুস্তাকে যত ভালবাসিত, তত ভালবাসিত না। ক্যালেব কিন্তু মিরিয়্যাম্‌কে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে লাগিল। যাহাহৌক, এইরূপে তাহারা একত্রে খেলা ধূলা করিতে করিতে কিশোর কিশোরী হইল।

য়ুদীরা তাহাদের প্রধান মন্দিরে পশু বলিদান করিত। এই যজ্ঞার্থ তাহারা ঈষানীদের নিকট কর চাহিল। পশু-বলির সঙ্কুলান জন্য কর দিতে ঈষানীরা অস্বীকার করিল। য়ুদীরা তাহাদের মঠাধ্যক্ষের আদেশ মত ঈষানীদের গ্রাম লুট করিয়া শস্যাদি লইয়া গেল। লুণ্ঠনকারীদিগের এক জনের সহিত ক্যালেবের কলহ হইল। সে ক্যালেবের স্কন্ধে আঘাত করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সে যখন গ্রাম হইতে বনান্তর দিয়া যায় তখন কোন গুপ্ত-মানব-প্রেরিত তীক্ষ্ণ শরাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। একটা মহা গণ্ডগোল হইল, ঈষানীরা বিদ্রোহী বলিয়া রোম্যানদিগের কাছে এত্তালা হইল।

একজন যুবক রোম্যানকর্ম্মচারী সাধারণতঃ ঈষানীদিগের আচরণ ব্যবহার সম্বন্ধে, বিশেষত-গুপ্তহত্যা সম্বন্ধে, তদারক করিবার ভার পাইলেন।

কর্ম্মচারীর নাম মারকস্; তাঁহার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। যুবা বড় দীর্ঘও নহে, হ্রস্বও নহে; একটু যেন কৃশ কিন্তু চাল-চলন খুব চালাকের মত। চক্ষু ঈষৎ কটা; হাসিলে অল্প অল্প দাঁত দেখা যায়; চেহারা দেখিলেই মনে হয় লোকটা বুঝি সৈন্যাধ্যক্ষ, অথচ বেশ কোমল প্রকৃতির। প্রথম দর্শনে মিরিয়্যাম্ বুঝিল যে, জগতের মধ্যে এই যুবককেই সে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে। ক্যালেবের উপরে মারকসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ক্রমে বিষদৃষ্টিতে পরিণত হইল। ক্যালেবও মারকসের উপর বিদ্বেষ পোষণ করিতে লাগিল। দুই জনেই কিন্তু মিরিয়্যাম্‌কে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে লাগিল। যে দেশে কুমারী বড় করিয়া অর্থাৎ কিশোরী বা যুবতী করিয়া বিবাহ দিবার রীতি আছে, সে দেশে এই দশাহ ঘটে। অর্থাৎ দুই যুবক এক যুবতীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া পরস্পরেই প্রতি পরস্পর বিদ্বেষভাব বহন করে। কি গ্রীক, কি রোম্যান, কি য়ুদী, কি বিলাতী, কি জর্ম্মান, কি ফ্রেঞ্চ—এই সকল জাতীয় পনের আনা গল্প-পুস্তকে ঐ কথার ওড়ন-পাড়ন লইয়াই কাহিনী। ঐ-

কথাই জান্, ঐ কথাই মজ্জা। আমরা এই গল্পে সেই মজ্জার সূত্র এখন দেখিতে পাইতেছি।

চারি জন শিক্ষকে মিরিয়্যাম্‌কে শিক্ষা দিত। একজন ছাঁচ গালাই, তক্ষণ ও ভাস্কর্য্য শিখাইত। মিরিয়্যাম্ অতি সুন্দররূপে ঢালাই করিতে পারিতেন, মর্ম্মর প্রস্তরে অতি সুন্দর মূর্ত্তি সকল খোদিত করিতেন। মারকস্ অতিথি হইয়া এই সকল খোদকারী দেখিলেন; তাঁহার মূর্ত্তি খোদিত করিতে মিরিয়্যাম্‌কে অনুরোধ করিলেন। মিরি-য়্যাম্ জ্ঞানবৃদ্ধগণের অনুমতি লইয়া তাঁহার মূর্ত্তি খোদিত করিতে লাগিলেন।

উদ্যানের নিভৃত স্থানে, ঝিলের ধারে, লতামণ্ডপে বসিয়া মারকস্ সিটিং দিতেন অর্থাৎ প্রতিমূর্ত্তির আদর্শভাবে বসিয়া থাকিতেন। মিরিয়্যাম্ কাজ করিত বটে, কিন্তু দুই জনে কত গল্প গুজব করিত, কত মনের কথা কহিত, আর ক্যালেব মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখিয়া তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিত।

অন্য সময়ে মারকস্ খুনের তদারক করেন; ঈষানীদের আচরণ সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখেন এবং নোট করেন। গুপ্ত সন্ধানে প্রকাশ পাইল যে, ক্যালেবই গুপ্তহত্যাকারী। এ কথার কাণাঘুসাও হইল। এক দিন মিরিয়্যাম্ ধরিয়া

বসিল যে, ক্যালেবকে অব্যাহতি দিতে হইবে। ক্যালেবকে দোষী সাব্যস্ত রাখিয়া তাহাকে কোনরূপে বাঁচাইতে মারকস্ স্বীকার করিলেন। ক্যালেব দূর হইতে আড়ি পাতিয়া এই ব্যাপার দেখিয়াছিল। বড় দূর হইতে বলিয়া কিছুই শুনিতে পায় নাই। হতভাগা উল্‌টা বুঝিল যে, তাহারই বিরুদ্ধে মারকস্, মিরিয়্যাম্ ও নেহুস্তা একটা ষড়যন্ত্র করিতেছে। সে গোপনে মারকসের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করিতে আসিল। যুদ্ধে তাহার হাতের কয়টা আঙ্গুল কাটা গেল। ক্যালেব পরাস্ত হইল; অপমানিত হইল; মারকস্ তাহাকে তাহার প্রাণ দান করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। ক্যালেব সন্ন্যাসীদের গ্রাম হইতে অবশ্য পলায়ন করিল। ক্যালেব জেরুসালেমে গেল। যে বৃদ্ধনারী তাহাকে ঈষানীদের বাড়ী রাখিয়াছিলেন, তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় লইল। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল; তদীয় পুত্র ক্যালেবকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। রোমের অধ্যক্ষের নিকট ক্যালেব অভিযোগ করিল যে, তাহার পিতৃত্যক্ত সম্পত্তি এক দল য়ুদী অন্যায় অধিকার করিয়া তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে। সম্পত্তির উদ্ধার হইলে রাজকোষে প্রভূত শুল্ক দান করিয়া এক মাস-মধ্যে সেই নিঃস্ব বালক প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হইল।

(৩)

ক্যালেব বালক কাল হইতেই চঞ্চলচিত্ত, উচ্চাভিলাষী, তেজস্বী, বলবান্ ও যুদ্ধপ্রিয় ছিল। এখন প্রভূত ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া দুরাকাঙ্ক্ষায় ফুলিয়া উঠিল। য়ুদীজাতির সৈন্যাধ্যক্ষ হইব, য়ুদীভূমি হইতে রোম্যান-দিগকে যুদ্ধ করিয়া তাড়াইয়া দিব, আপনি য়ুদীভূমির রাজা হইব—এই সকল দুরাকাঙ্ক্ষা ক্যালেব গোপনে হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিল; আর রাজা হইয়া মিরিয়্যামকে বিবাহ করিয়া তাহাকে রাণী করিব এ কথাও তাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা ফুটিয়া উঠিত।

ক্যালেব টায়র নগরীতে চলিল, সেখানে আপনার নষ্ট সম্পত্তি হস্তগত করিবে, আর বৃদ্ধ ধনী সওদাগর বেনোনির সহিত সাক্ষাৎ করিবে। বেনোনি মিরিয়্যামের মাতামহ। মিরিয়্যামের পিতা নাই, মাতা নাই, মাতামহই এখন তাহার রক্ষক। ক্যালেবের মত তিনি জাতিতে এবং ধর্ম্মে য়ুদী। ক্যালেব চাহিলে বেনোনি ক্যালেবেরই সহিত মিরিয়্যামের বিবাহ দিতে পারেন; কেনই বা না দিবেন?

বেনোনি একদিন অপরাহ্নে নিত্যকার্য্য শেষ করিয়া সমুদ্র-তীরস্থ প্রশস্ত ভবনে বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময়ে ক্যালেব গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। মিরিয়্যামের

সহিত সে যে একত্র ঈষানী ভূমিতে লালিত পালিত হইয়াছিল এবং মিরিয়্যাম্ সম্ভবতঃ যে বেনোনির আত্মীয়া সে কথা ও আরও নানা কথা গল্প গুজব করিয়া চলিয়া গেল। পরক্ষণেই মারকস্ দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহার সহিত বেনোনির মিরিয়্যাম্ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হইল। বেনোনিকে মারকস্ স্পষ্ট বলিলেন, "আপনি যদি মিরিয়্যামের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্যালেবের সহিত তাহার বিবাহ দেন, তাহা হইলে মহা অনর্থপাত হইবে।" বেনোনি রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতেছেন, ইচ্ছা করিলে মারকস্ তখনি তাঁহাকে রোমে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতে পারেন। বেনোনি স্পষ্টতঃ বলিলেন যে, মিরিয়্যামের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার বিবাহ দিবেন না। মারকস্ চলিয়া গেলে আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "ক্যালেব য়ুদী হইলে কি হয়, সে পাজি ; তাহার সহিত মিরিয়্যামের বিবাহ দিব কেন ; তাহা অপেক্ষা এই রোম্যান যুবক শতগুণে ভাল।"

(৪)

বৃদ্ধ বেনোনি অর্থপিশাচ; 'অর্থ' 'অর্থ' করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়াছে। ধর্ম্মেও পিশাচ ; ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া জামাতাকে প্রাণে বধ করাইয়াছে, কন্যার শত লাঞ্ছনা করাইয়াছে ; কিন্তু পিশাচই হোক আর রাক্ষসই হোক

মানুষ ত বটে। মানুষ রক্তের টান শীঘ্র এড়াইতে পারে না। বেনোনি যেমন মিরিয়্যামের কথা শুনিল, বুঝিল, অমনি মিরিয়্যাম্‌কে দেখিতে, তাহাকে স্বীয় ভবনে আনয়ন করিতে, আদরে লালিত পালিত করিতে তাহার ইচ্ছা হইল। বেনোনি দলে বলে ঈষানীক্ষেত্রে গমন করিল। দৌহিত্রার উপর দাবি করিল। আবার শত বৃদ্ধ সমবেত হইলেন। বেনোনী যে মিরিয়্যাম্‌কে স্বধর্ম্মে প্রতিপালন করিবে, মিরিয়্যামের ইচ্ছা-মত খ্রীষ্টান যুবকের সহিত তাহার বিবাহ দিবে, যৌতুকের রীতিমত বন্দোবস্ত করিবে, এই সকল কথা পাকা করিয়া লেখাইয়া লইয়া সন্ন্যাসীরা মিরিয়্যাম্‌কে মাতামহের করে অর্পণ করিলেন। বৃদ্ধ আইগিয়্যাল কাঁদিয়া আকুল হইল বটে তবু মিরিয়্যাম্‌কে বলিল, "আমার বিশ্বাস যে তোমার সহিত আবার দেখা হইবে।"

টায়র নগরে বেনোনির সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী বিস্তৃত প্রাসাদে মিরিয়্যাম্ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ছিলেন সন্ন্যাসিক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ প্রান্তর-মধ্যে, লতামণ্ডপে কুটীরবাসিনী বনদেবী,—এখন হইলেন তরঙ্গসঙ্কুলসাগরপার্শ্বে সুরম্য হর্ম্ম্য-মধ্যে রাজ-রাজেশ্বরী। যৌবনে বেনোনির খ্রীষ্টধর্ম্মের উপর বড়ই ঘৃণা ছিল; এখন রক্তের জোর কমিয়াছিল, বৃদ্ধ বয়সে আপনার লোকের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন, এমন দিনে

মিরিয়্যাম্‌কে পাইয়া বুড়া তাহাকে ভালবাসিতে লাগিল। মিরিয়্যাম্‌ও পিতৃহন্তা মাতামহকে ভালবাসিতে পারিল। রক্তের টান বড় টান!

মারকস্‌কে মিরিয়্যামের সর্ব্বদাই মনে পড়ে। মিরিয়্যাম্‌ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিবে না, এটী মিরিয়্যামের মাতার মরণ-কালের অনুরোধ। মিরিয়্যামের মনের ভাবও সেইরূপ। মারকসের সহিত মিরিয়্যামের বিবাহ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তা'ত নাই, তা বলিয়া কেহ ভাবিতে ছাড়ে না! তা ভাবিয়াই বা কি হইবে? "ইদানীম্‌ আবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ,"—কোথায় মারকস্‌ আর কোথায় মিরিয়্যাম্‌। মারকস্‌ হয়ত রণোন্মাদে পদ-গৌরবে ভোগৈশ্বর্য্যে মিরিয়্যামকে ভুলিয়াছে? না মারকস্‌ ভুলেন নাই।

গ্যালস্‌ বলিয়া একজন রোম্যান দূত হঠাৎ একদিন আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মিরিয়্যাম্‌কে মারকসের একখানি পত্র দিল; সঙ্গে সঙ্গে একটী পুলিন্দা দিল; তাহার মধ্যে একটী বহুমূল্য অঙ্গুরীয়ক ও এক ছড়া মোতির হার। পত্রে মারকস্‌ লিখিয়াছেন যে, খুল্লতাতের মৃত্যুতে তিনি মহা ধনী হইয়াছেন এবং সম্রাটের আদরে মহা আদৃত হইয়াও বিপন্ন। মিরিয়্যাম্‌-খোদিত মারকসের সেই মূর্ত্তি সম্রাট্‌ দেখিয়া, শিল্পীর

আদরের জন্য তাহা নবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; ধূপ দীপ পুষ্প্ চন্দনাদি দ্বারা মূর্ত্তি-পূজা হইয়া থাকে; আর মারকস্‌ই সেই পূজার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতটা কাণ্ড হইয়াছে মারকসের একটা মিথ্যা কথার জন্য। মারকস্ ভয় করিয়াছিলেন যে, শিল্পিনীর পরিচয় পাইলে সম্রাট্ মুগ্ধ হইয়া পড়িবেন,—তাহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করিবেন; কাজেই ভয়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে, শিল্পিনী ইহসংসারে আর নাই। ফল এই হইয়াছে—মারকস্ শিল্প-পূজার পর্য্যবেক্ষণের ভার পাইয়া রোম ছাড়িয়া তিলার্দ্ধ যাইতে পারেন না। মারকস্ পত্রের উপসংহার করিয়াছেন, "মিরিয়াম্! আমার মত দুঃখী আছে কি?" আমরা কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না মারকস্ দুঃখী কি সুখী। সুখীই বলিতে হইবে, নতুবা পত্র-পাঠে মিরিয়্যামের এত আনন্দ কেন?

এদিকে য়ুদীরা রোম্যানদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। টায়র নগরীতে বৃদ্ধ বেনোনির বাড়ীতে বেনোনিকে লইয়া ষড়যন্ত্রকারিগণের সভা হইতে লাগিল। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ক্যালেবও সেখানে যাতায়াত করিতে লাগিল। ক্যালেব এখন একজন সেনাপতি; তাহার বিক্রমে মাসাদা দুর্গ হইতে রোম্যানরা এখন বিতাড়িত হইয়াছে। বেনোনির বাড়ীতে ক্যালেবের সহিত মিরিয়্যামের

দেখা সাক্ষাৎ হইল। ক্যালেব কহিল, "আমি য়ুদীদিগের রাজা হইব, তোমাকে রাণী করিব; আমাকে বিবাহ কর।" মিরিয়াম্ কহিল, "তুমি ত জান যে আমি অখ্রীষ্টানকে বিবাহ করিতে পারিব না।" ক্যালেব জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যদি খ্রীষ্টান হইতাম?" মিরিয়াম্ বলিল, "তাহা হইলেও পারিতাম না। আমি মারকস্‌কে ভালবাসি। তবে তিনি খ্রীষ্টান নন, তাঁহাকেও বিবাহ করিতে পারিব না।" ক্যালেব ভ্রূকুটি করিয়া চলিয়া গেল।

দুই বৎসর মধ্যে য়ুদীরাজধানী জেরুসালেম নগরে মহা আকুণ্ডকুণ্ড বাধিয়া উঠিল। রোমের বিরুদ্ধে য়ুদীরা প্রকাশ্য অভ্যুত্থান করিয়াছে; শত শত সম্প্রদায় ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে মহা বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছে। এক জনের নায়কত্ব স্বীকার করে না, সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান। সকলেই মনে করে রোমের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিয়া ধন লুণ্ঠন করিব, কর্ত্তৃত্ব হস্তগত করিব, রাজা হইব। এইরূপে আপনাদেরই মধ্যে মারা-মারি কাটাকাটি আরম্ভ হইল। বেস্পেসিয়ান্ তখন রোমের সম্রাট্। তিনি স্বীয় পুত্র টাইটাস্‌কে প্রধান সেনাপতি করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। টাইটাস্ দলে বলে আসিয়া মহাবিক্রমে জেরুসালেম আক্রমণ করিলেন।

ওদিকে সিরিয়াবাসীরা বেনোনির প্রাকার-বেষ্টিত দুর্গ-

সদৃশ প্রাসাদ আক্রমণ করিল। ক্যালেব আপনার জীবন তুচ্ছ করিয়া জলপথে জাহাজ লইয়া আসিয়া বেনোনি, মিরিয়্যাম্ এবং নেহুস্তার উদ্ধার-সাধন করিল। সকলে বারণ করিলেও বেনোনি জেরুসালেমে আশ্রয়ের জন্য গেলেন। অতি কষ্টে নগরীতে স্থান পাইলেন। সকলেই প্রাণভয়ে ভীত. ক্যালেব ও বেনোনি কোথায় গেলেন তাহার স্থিরতা নাই। নেহুস্তা মিরিয়্যাম্‌কে লইয়া একটী নিভৃত গুহায় স্থান পাইল। যুদ্ধবিগ্রহে সেই শান্তশীল সন্তোষপ্রিয় সন্ন্যাসীর দল এখন ছিন্ন ভিন্ন বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। সম্প্রদায়ের অবশিষ্টাংশ লাঞ্ছিত—তাড়িত হইয়া জেরুসালেম নগরের প্রান্ত দেশের জঙ্গলের মধ্যে গুহার ভিতর আশ্রয় লইয়াছে। তাহারাই আবার মিরিয়্যাম্-নেহুস্তাকে আশ্রয় দিল। তাঁহারা গুহায় থাকেন, কখন কখন সুড়ঙ্গপথে একটী প্রাচীন মঠের মধ্যে যান; কখন কখনও বা সেই মঠের উপরতলায় সোপান অবলম্বনে উঠেন। অলিন্দের গবাক্ষ দিয়া নগর-ব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ দর্শন করেন।

এক দিন তাঁহারা দেখেন কি, সৈন্যদলমধ্যে স্বয়ং মারকস্ দড়বড়ি ঘোড়াচড়ি রণরঙ্গে চলিয়াছেন। ক্যালেবের সেনাদল তাঁহাকে প্রতিরোধ করিল। ক্যালেব মারকস্‌কে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিল। বিষম যুদ্ধে ভীষণ অস্ত্রাঘাতে

মারকস্‌কে ধরাশায়ী করিয়া ক্যালেব দলে বলে চলিয়া গেল।

মারকস্‌কে বন্দী করিয়া শত্রুপক্ষেরা সেই মঠের মধ্যে একটী বৃহৎ প্রকোষ্ঠে রাখিল; বহির্ভাগে খাড়া পাহারা রহিল। সেই প্রকোষ্ঠের একটা গুপ্ত দ্বার ছিল, দ্বারটী বন্ধ থাকিলে কেহই বুঝিতে পারিত না যে, সেখানে একটী দ্বার আছে। বিশেষ কৌশলে সেই দ্বারটী খোলা দেওয়া যাইত। সেই গুপ্তদ্বার দিয়া নেহুস্তা ও মিরিয়্যাম্ প্রবেশ করিয়া প্রাপ্ত-চেতন মারকস্‌কে উঠাইয়া লইল। নেহুস্তা মারকস্‌কে কোলে লইয়া সুড়ঙ্গে চলিয়া গেলে দ্বারটী বন্ধ হইয়া গেল, মিরিয়্যাম্ রক্ষিগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। আর তাঁহা কর্ত্তৃক যে মারকসের উদ্ধারসাধন হইয়াছে এইরূপ সকলে অনুমান করিল কিন্তু গুপ্তদ্বারের সংবাদ কেহই পাইল না। একজন সৈনিক মিরিয়্যামের শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু ক্যালেব তথায় উপস্থিত থাকায় তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিল। মিরিয়্যাম্ বন্দিনী হইয়া বিচারগৃহে নীত হইল। বিধির বিড়ম্বনায় বিচারপতিগণের মধ্যে বেনোনি অধিষ্ঠিত। মিরিয়্যামের দণ্ড হইল যে, নিকালর নামক দ্বারের তোরণের উপরে রৌদ্রে মিরিয়্যাম্ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বন্দিনী থাকিবেন। সেইরূপে আছেন; ক্যালেব তাঁহাকে উদ্ধার করিতে আসিল,

বলিল, "আমি খ্রীষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছি, আমাকে বিবাহ কর। আমি তোমাকে উদ্ধার করিব।" মিরিয়্যাম্ উত্তর করিলেন, "আমার জন্য খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সে ত খ্রীষ্টান হওয়া হইল না। সুতরাং আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারিব না।" ক্যালেব আবার ভ্রূকুটি করিয়া চলিয়া গেল। মিরিয়্যাম্ এত যে নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, কিন্তু তবু তাঁহার কণ্ঠে মারকসের দেওয়া সেই মোতির মালা ঝলসিছে,—সেটা যে তাঁহার ইষ্ট-কবচ। তাঁহার রক্ষাদের মধ্যে একজন লোলুপ হইয়া সেই মালা খুলিতে আসিতেছে দেখিয়া ক্যালেব ঘুরিয়া আসিয়া স্বীয় ভীম-তরবারিতে তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিল; অন্য রক্ষীরা একটু চকিত হইয়া পরক্ষণেই হাসিয়া উঠিল,—যেমন রোগ তা'র তেমনি ঔষধ!

তিন দিন তিন রাত্রি মিরিয়্যাম্ ঐ রূপে ফটকের উপর তেতালার ফাঁকা ছাদে পাথরের থামে শিকলে বাঁধা অবস্থায় কাটাইলেন। কেহ এক টুক্‌রা রুটি—এক ফোঁটা জল দিল না। সকাল বিকাল থামের আড়ালে একটু ছায়া পান, সেইখানটীতে বসিয়া থাকেন; ঠিক রৌদ্রের বেলায় ছায়া পড়ে না, মাথা ফাটিয়া যায়, প্রাণ শুকাইয়া উঠে, পিপাসায় ছাতি ফাটে—এক বিন্দু জল দিবার কেহ নাই। রাত্রিতে ঠাণ্ডা হয়, কাপড় চোপড় শিশিরে ভিজিয়া উঠে; পাথরের

থামের গায়ে শিশির জমিয়া গড়াইতে থাকে, তাহাই জিহ্বা দিয়া লেহন করেন, দিবসের তৃষ্ণা নিবারণ করেন। কাজেই সোণার কমল শুকাইতে লাগিল। অনেক দূর হইতে এই দুর্দ্দশা উভয় পক্ষের সৈন্যেরা দেখিতে লাগিল, কিন্তু সে রণোন্মাদে কে কাহাকে দয়া করিবে।

রণোন্মাদই বটে। যুদ্ধারম্ভে টাইটস্ আদেশ দেন যে, প্রাণপণে সকলে লড়াই করিবে বটে, প্রাণিহত্যাও অবশ্য-ম্ভাবী, কিন্তু মঠ-মন্দিরগুলি, এমন কি বাহিরের প্রাচীর পর্য্যন্ত যেন অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, সংগ্রামের আর বিরাম নাই তখন হুকুম দিলেন, "তোরণ-দ্বারে আগুন লাগাও।" বাণ বর্শার বৃষ্টিপাত মস্তকে—হৃদয়ে ধারণ করিয়া রোম্যান সৈন্য ভীষণ উল্কা হস্তে অগ্রসর হইয়া, যে যেখানে পারিল আগুন লাগাইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষকাণ্ডের তোরণ-রক্ষণ সকল কালী করালী জিহ্বা বিস্তার করিয়া ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলিতে লাগিল; ধূমে সমরাঙ্গন আচ্ছন্ন হইল; অন্ধকার হইয়া আসিল; অস্ত্র-চালনা চলিয়াছে, কিন্তু শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে কে কাহাকে মারিতেছে, তাহা আর বুঝা যায় না। তোরণে উচ্চ প্রকোষ্ঠে মিরিয়াম্ শৃঙ্খলাবদ্ধ, ধূমরাশি সেখান পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিল; মিরিয়াম্ প্রাসাদের

সীমার নিকট আসিয়া দেখিলেন, নিম্নে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে।

(৫)

ধবক্ ধবক্ লক্ লক্ করিয়া সহস্র জিহ্বায় অগ্নি ক্রমেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল। যেদিক্ হইতে বায়ু বহিতেছিল, তাহার বিপরীত দিক্ একেবারে ধূমে আচ্ছন্ন হইল; সে দিকে আর কিছুই দেখা যায় না! মিরিয়্যাম্—শুষ্ক শীর্ণ ম্রিয়মাণা মিরিয়্যাম্, তিনদিক্ বেশ দেখিতে পাইতেছে; লোকেরাও সেই সকল দিক্ হইতে তাহাকে প্রাসাদ-উপরি আবদ্ধা দেখিতেছে। স্বয়ং টাইটস্ অশ্বারোহণে সৈন্যাধ্যক্ষ ভাবে বিচরণ করিতেছেন। মিরিয়্যাম্ দেখিলেন, টাইটস্ তাহাকে প্রাণে না মারিতে আদেশ দিলেন। বেনোনি যুদ্ধ করিতে করিতে আসিল; মিরিয়্যাম্কে দেখিল, চিনিল; যুদ্ধ করিতে করিতে বহ্নি-সাগরে ঝম্প প্রদান করিল; মিরিয়্যাম্ মাতামহের পরিণাম দেখিল; ভগবানকে স্মরণ করিল। পরে বসিয়া পড়িল, শয়ন করিল, ক্রমে সংজ্ঞা হারাইল; বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য, কিন্তু কত স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। নবধর্ম্মী ঈশাপন্থীদিগের কত পুরাণকাহিনী তাহার চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল।—যেন কোন বাজীকর তাহার সম্মুখে পট খুলিতেছে ও

ঢাকিতেছে। স্বপ্ন হইতে ক্রমে সুষুপ্তি হইল। মোহ ভঙ্গের পর, একটু যেন বল পাইল; কিন্তু তখন অগ্নিরাশি চারিদিকে চৌগুন জ্বলিতেছে।

য়ুদীদিগের সর্ব্বনাশ সাধন হইল! য়ুদীরা অতি প্রাচীন জাতি—সমৃদ্ধি-সম্পন্ন জাতি; আপনাদিগকে পরমেশ্বরের প্রিয়তম জাতি বলিয়া বিশ্বাস করে। সেই বিশ্বাসে তাহারা দৃঢ় ভক্তি হৃদয়ে পোষণ করে। নর-নারী—দেখিতে সুন্দর সুশ্রী; অনেকেই দীর্ঘজীবী, সঙ্গীতপটু, অন্যান্য কলায় বিশেষ পারদর্শী। যে কালের কথা বলিতেছি, তাহার এগারশত বারশত বৎসর পূর্ব্বে, জিহোবা ভগবানের উদ্দেশে য়ুদীরা এক বিশাল অপূর্ব্ব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সেই মন্দির কত মহাভক্ত কত রত্নরাজি দিয়া সজ্জিত করিয়াছিলেন, তাহার সীমা নাই; কত সুন্দর ভাস্কর-কার্য্যে, কত অপূর্ব্ব চিত্রণে—প্রকোষ্ঠ-প্রাচীর অলঙ্কৃত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। য়ুদীদিগের এই জিহোবা-মন্দির জগতে অতুল্য ছিল। দুর্গ গ্রাস করিয়া ভীষণ অগ্নিরাশি যখন দুর্গ-সংলগ্ন মন্দির ধ্বংস করিতে ছুটিল, তখন শত্রু-মিত্র সকলের সন্ত্রাস উপস্থিত হইল। জগতের অমূল্য মন্দির রক্ষা করিবার উপায় কি? রোম্যানরা কলা বিস্তার আদর করিত, তাহারা কলা-

মন্দিরের ধ্বংসকারী রূপে জগতে চিরপরিচিত হইতে মহা লজ্জা বোধ করিল। টাইটস্ আদেশ দিলেন, অগ্নি নির্ব্বাপিত কর, যেমন করিয়া পার মন্দির রক্ষা কর। আর রক্ষা কর! সে প্রলয়াগ্নি কি আর থামান যায়? তবু চেষ্টা হইতে লাগিল। ধূমে ধূমাচ্ছন্ন হইল,—রৌদ্রের তেজ নাই।

মিরিয়্যামের পক্ষে কথঞ্চিৎ ভাল হইল; দুইদিনের দুই প্রহরের রৌদ্র মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, তৃতীয় দিনের রৌদ্র ধূমে বুঝিতে পারিল না; কিন্তু ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ যায়! ক্যালেব এখনও ভূলে নাই। সে কিরূপে কি জানি এক বোতল পানীয় আর খানিকটা শুকা রুটি একটা চোঙ্গায় পূরিয়া ঠিক মিরিয়্যামের পদতলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। মিরিয়্যাম্ বুঝিল; কোন রূপে উহা নিকটে আনিয়া ক্ষুধা পিপাসা কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি করিল।

য়ুদীদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। মন্দিরে বেড়া আগুন লাগিয়াছে। রোম্যানরা য়ুদীদিগকে মারিয়া ফেলিতেছে, তাহাদের রক্তে অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা করিতেছে। নর-শোণিত-স্বাদে ধনঞ্জয় জ্বল্ জ্বল্ করিয়া শিখা-বিস্তার করিতেছে। হা ভগবানের প্রিয়তম পাত্র, ভগবানের মন্দির রক্ষা করিতে পারিলে না? হা রোম! গ্রীসের

কলা-শিল্প রক্ষা করিলে, আর এই হতভাগ্যগণের যুগ-যুগ-সঞ্চিত অপূর্ব্ব কলাকীর্ত্তি একেবারে ধ্বংস-সাধন করিলে !

টাইটস্ ইতিপূর্ব্বে দূর হইতে দেখিয়া মিরিয়্যাম্‌কে রক্ষা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন—এখন সে দিকের অগ্নি প্রায় নিবিয়াছে, দরজা ভাঙ্গিয়া কতকগুলি লোক সেই ছাদের উপর উঠিল। মিরিয়্যাম্ তখন অবসন্ন হইয়া শুইয়াছিল ; তাহার হাতের পায়ের শৃঙ্খল কাটিল ; এক যুবা পুরুষ তাহাকে স্কন্ধে তুলিয়া আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া নামাইয়া লইয়া গেলেন।

সেইদিক্ দিয়া টাইটস্ যাইতে ছিলেন ; তিনি বাহক যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেনাপতি ! কাহাকে আপনি বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন ?"

উত্তর—"সেই কুমারীকে, যাহাকে আপনি রক্ষা করিতে আদেশ করেন।"

"ভাল ; উহাকে তোমার জিম্বায় আমি রাখিলাম। ঐ কুমারী আমার বন্দিনী। যদি গৌরবে আমরা রোম নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারি, তবে ঐ বন্দিনীও আমাদের গৌরব-বর্দ্ধনের জন্য প্রকাশ্য ভাবে যাত্রিমধ্যে প্রদর্শিত হইবে ; পরে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইলে, সেই পণের টাকায় সৈনিকদের শুশ্রূষা হইবে।"

সেনাপতি বলিলেন, "আমি ইহাকে আমার শিবিরে আমার কন্যার ন্যায় রাখিব ও রোমে পাঠাইয়া দিব।" টাইটস্ বলিলেন, "তোমরা উপস্থিত সকলে আমার আদেশ ও সেনাপতির অঙ্গীকার শুনিলে, মনে রাখিও।"

কে জানে মিরিয়ামের অদৃষ্টে আরও কত কি আছে?

অপূর্ব্ব জিহোবা-মন্দির পুড়িয়া ভস্মস্তূপ হইল, কিন্তু লড়াই থামিল না। যে সেনাপতি মিরিয়াম্‌কে উদ্ধার করিয়াছেন, যাঁহার রক্ষণে মিরিয়াম্ এখন জীবিত, তাঁহার পায়ে বল্লমের আঘাতে মহা ক্ষত হইয়াছে; তিনি সমর-স্থান হইতে বিদায় পাইলেন, রোমে ফিরিয়া যাইতে আদিষ্ট হইলেন। লুণ্ঠিত বহুমূল্য দ্রব্য-সম্ভার ও মৃতপ্রায় মিরিয়াম্‌কে লইয়া তিনি জাহাজে করিয়া রোমে ফিরিবেন। জাহাজ টায়র হইতে ছাড়িবে; স্থল-পথে শকটে তাঁহাদের টায়র যাইতে হইল। সন্ধ্যার সময় সকলে টায়রে পৌঁছিলেন। সমুদ্রোপকূলে শান্তিময় স্থানে আসিয়া সমুদ্র-সমীরের মৃদুস্পর্শে মিরিয়ামের সুনিদ্রা হইল। প্রভাতে মিরিয়াম্ বাতায়নপথে অকূল সাগর দেখিতেছেন, আর যেন একটু জ্ঞান-সঞ্চার হইতেছে,—ভাবিতেছেন, "বেশ সুন্দর! এ কোথায় আসিয়াছি?"

মিরিয়াম্ উঠিয়া বসিলেন, দাঁড়াইয়া উঠিলেন, এক পা

এক পা করিয়া উপবনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একটী বৃক্ষের ছায়ায় একখানি শিলাখণ্ডে, সমুদ্রোপকূলে ধীরে ধীরে উপবেশন করিলেন, আবার ভাবিতেছেন, "বেশ সুন্দর! এ কোথায়—সেই স্থান নয়?"

তাঁহার রক্ষক সেনাপতি খুঁজিতে খুঁজিতে তাঁহার নিকটে আসিলেন। মিরিয়াম্ সুস্থ হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহার আনন্দ আর ধরে না।

"বাছা, আজ তুমি বেশ ভাল আছ?" "তা আছি" বলিয়া মিরিয়াম্ অতি সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি টায়র নগরী? এই উপবন কি আমার মাতামহের?" "তাই বটে; আমি কে বলিতে পার?" "আপনাকে আমি কি পূর্ব্বে দেখিয়াছি?" "দেখিয়াছ বৈ কি মা? তোমাকে এখন সৈন্যেরা সকলেই মোতি-কুমারী বলে—ঐ গলায় মোতির মালার জন্য। ঐ মোতির হার কে আনিয়াছিল, মনে আছে মা?"

মিরিয়াম্ অনেকক্ষণ ধরিয়া সেনাপতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর মারকস্-প্রেরিত পুলিন্দা এই বেনোনি-ভবনেই পাইয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল। মনে পড়িল গ্যালস্ নামে একজন সৈনিক ঐ সকল রোম হইতে আনিয়াছিলেন। স্মরণ হইল তাঁহার সম্মুখস্থ উদ্ধারকর্ত্তা

সেই গ্যালস্। তখন বৃদ্ধের সহিত কুমারী কত কথা কহিতে লাগিল। কথা হইতে হইতে মিরিয়্যাম্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, আপনি আমাকে এত স্নেহ করেন কেন ?"

"অনেক কারণে মা, অনেক কারণে। প্রথমতঃ তুমি আমার সহচর মারকসের প্রিয়বস্তু—হয়ত সেই মারকস্ জীবিত নাই। দ্বিতীয়তঃ, তোমাকে মুমূর্ষু অবস্থায় আমি রক্ষা করি; তৃতীয়তঃ, আমার কন্যাটী জীবিত থাকিলে ঠিক তোমার মত হইত"—বলিতে বলিতে বৃদ্ধ দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিলেন। "মারকস্ জীবিত নাই, আপনি কিরূপে বুঝিতেছেন ?" "থাকিলেও তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে, যাহারা জীবিত শরীরে শত্রু কর্ত্তৃক বন্দী হয়, রোম তাহাদের জন্য প্রাণদণ্ডই এক মাত্র ব্যবস্থা করিয়াছে।" মারকস্ জীবিত আছেন কি না, জীবিত থাকিলে তাঁহাকে মিরিয়্যামের অদৃষ্টের কথা জানান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। অনেক অনুসন্ধানে ঈষানীদের নিম্ন শ্রেণীর একটী লোক পাওয়া গেল। তাহার হস্তে মিরিয়্যাম্ পত্র দিলেন; বিশ্বাসী বোধ করিলেন; গ্যালস্ তাহাকে পাথেয় স্বরূপ কিছু দিতে চাহিলে এবং পারিতোষিকের প্রলোভন দিলে সে বলিল, "পরের উপকার পারি ত প্রাণ দিয়া করি, তাহার

জন্য পয়সা লইব কেন? সৎকর্ম্মের পুরস্কার ইহকালে হয় না, অন্যত্র হয়।” গ্যালস্ শুনিয়া বলিলেন, “এ দেশে অদ্ভুত জীব বিস্তর আছে।”

বহুতর ধন রত্ন, অনেকগুলি পীড়িত আহত সৈনিক এবং উপযুক্ত রক্ষী লইয়া, শুভক্ষণে সুবাতাসে জাহাজ ছাড়িয়া দিল; একমাসে ইটালীর একটী নগরীতে পৌছিল। সেখান হইতে রোমে জল-পথে যাইতে হইল। বিজয়ীদের সর্ব্বত্রই আদর ও সম্ভাষণ। গ্যালসের রক্ষণাবেক্ষণে মিরিয়্যাম্ স্বচ্ছন্দ শরীরে রোমে আসিলেন।

(৬)

বাস্তবিকই মারকসের কি হইয়াছে—তাহা আমাদের জানিতেও ত ইচ্ছা হইতেছে। সেই যে মৃতবৎ তাঁহাকে কোলে করিয়া নেহুস্তা গুপ্তদ্বার দিয়া লইয়া গেল, আর দ্বার বন্ধ হইল, মিরিয়্যাম্ বন্দিনী হইলেন,—তাহার পর, তাঁহার আর কোন সন্ধানই ত পাওয়া যায় নাই; য়ুদী জাতি বিধ্বস্ত হইল, তাহাদের কত কালের পবিত্র জিহোবা-মন্দির পুড়িয়া ক্ষার হইল, কিন্তু মারকসের ত কোন সংবাদই নাই। মারকস্ যখন সেই ভগ্ন-প্রাসাদের ভিন্ন প্রকোষ্ঠে নীত হইয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা মিরিয়্যাম্‌কে শত্রু-হস্তে দিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, তখন

তাঁহার আর ক্ষোভের সীমা রহিল না। ক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে আস্ফালন,—"প্রাচীর ভাঙ্গিব, একলা যুদ্ধ করিয়া মিরিয়্যাম্‌কে উদ্ধার করিব।" সেই আস্ফালনের পর অবসাদ আসিল; ভগ্ন-দেহে রুগ্ন-মনে অবসাদ তাঁহাকে ধরাশায়ী করিল। গুপ্ত পথে আইথিয়্যাল আসিয়া তাঁহার সন্ধান লইলেন; পরে লোকজন লইয়া আসিয়া মারকস্‌কে শিবিকায় বহন করিয়া দুর্গম অরণ্য-গুহা-মধ্যে লইয়া গেলেন।

ঈষানী সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট লোক এখন এইরূপ শৃগাল-তরক্ষুর মত বাস করিতেছিলেন। অন্ধ গুহায় মারকস্‌ জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ঈষানীদের মধ্যে সুচিকিৎসক ছিল। তাঁহার ক্ষতের চিকিৎসা সুন্দর রূপ হইতে লাগিল।

ডামাডোল থামিয়াছে। রোম্যান রক্ষিবর্গের শৈথিল্য হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে ঈষানীরা অন্যত্র যাইতে পারে—আর যাইতেও হইবে, কেন না সঞ্চিত খাদ্য প্রায় শেষ হইয়াছে। কিন্তু মারকসের কি হইবে? মিরিয়্যাম্‌কে ঈষানীরা রাজরাজেশ্বরী বলিত। সেই রাজরাজেশ্বরী মারকস্‌কে বাঁচাইতে গিয়া বন্দী হইয়াছে, লাঞ্ছিত হইয়াছে। সে যে মারকস্‌কে ভালবাসে। সে আজি উপস্থিত থাকিলে

সেই মারকস্‌কে আশ্রয় দিতে অনুরোধ করিত, সে অনুরোধ রক্ষা করিতে হইত; এখনও যেন সেই অনুরোধ আছে মনে করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। ঈষানীক্ষেত্রে ঈষানীরা চলিল, মারকস্‌কে যানারোহণে সঙ্গে করিয়া লইল। সেই জর্ডন-তীরে আবার আসিল।

সে পুণ্যক্ষেত্রের এখন আর কিছুই নাই। রোম্যান সৈন্য সমস্ত বিধ্বস্ত করিয়াছে। সেই শস্যবহুল উর্ব্বর ক্ষেত্র এখন কণ্টকাকীর্ণ উষর ভূমি। সেই সারি সারি পুণ্য পবিত্র কুটীরগুলি—সমস্তই পড়িয়া গিয়াছে। সেই সুবিশাল মন্ত্রণা-মন্দির কেবল ভস্মস্তূপ; সেই চারিদিকের পাদপ-আশ্রিত লতাকুঞ্জ—সকলই বন হইয়াছে। ঈষানীদের অতিথিশালা এখন শ্বাপদের বিলাস-ভূমি।

আছে কেবল পর্ব্বত-গুহায় লুক্কায়িত গুপ্ত শস্যাগার দুই চারিটী। তাহাতেই কথঞ্চিৎরূপে অর্দ্ধ বৎসরের আহারের সংস্থান হইল। নূতন শস্য পাকিয়া উঠিল; খামারে আনীত হইল; ঘর বাড়ী বাঁধা হইয়াছে; শস্য গৃহজাত হইল। আবার ঈষানী-ক্ষেত্র হাসিতে লাগিল।

মারকস্ সবল সুস্থ হইলেন। যেখানে মিরিয়্যামের ভাস্কর-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, সেইখানে ভাঙ্গা মার্ব্বেল পাথর-গুলি পড়িয়া পড়িয়া দেখেন;

302

"যখন তুয়া বঁধু পড়ে মনে।
আমি চাহি বৃন্দাবন পানে॥"

পাঁচ মাস এইরূপে গেল। মিরিয়্যামের দূত, যে পত্র ও অঙ্গুরীয়ক লইয়া আসিতেছিল, সে রোম্যানদের কাছে ধরা পড়িয়া বন্দী ছিল; পত্র খোয়া গিয়াছে; অঙ্গুরীয়ক আছে, তাই নিশানা লইয়া আসিয়া মারকস্-নেহুস্তার সঙ্গে দেখা করিল। তিনি সমস্তই জানিতে পারিলেন। ঈষানীদের কাছে আপন মুক্তি-ভিক্ষা চাহিলেন; বলিলেন, "আমি দেশে যাইয়া যদি সময়ে পৌঁছিতে পারি মিরিয়্যাম্‌কে উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিব; সে বিবাহ করিলে, তাহাকে বিবাহ করিব, না করিলে, তাহাকে মুক্তি দান করিব।" ঈষানীদের মন্ত্রণা-সভায় মারকসের আবেদন গ্রাহ্য হইল। মারকস্ ও নেহুস্তা আইথিয়্যালের নিকট বিদায় লইয়া রোমের জন্য যাত্রা করিলেন। আইথিয়্যালের শেষ আশীর্ব্বাদ মিরিয়্যামের শিরে বর্ষিত হইতে লাগিল।

আর ক্যালেব? ক্যালেবের কি হইল? তাহাকে বেনোনি পাজিই বলুন, আর যাই বলুন, সে কিন্তু প্রাণের সহিত মিরিয়্যাম্‌কে ভালবাসে,—পৃথিবীর সকল জিনিষের চেয়ে ভালবাসে; আপনার প্রাণ তুচ্ছ করিয়া কতবার মিরিয়্যাম্‌কে রক্ষা করিয়াছে। সেই যে সে খাদ্য ও পানীয়

চোঙ্গাতে করিয়া মিরিয়্যামের নিকট ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহার পর ত তাহাকে দেখা যায় নাই; সে গেল কোথায়? কোথায়? এ দিকে য়ুদীদের আসিবার কি আর উপায় আছে? তাহারা এখন শৃগাল-কুকুরের ন্যায় বাস করিতেছে।

তবে কি ক্যালেব একবারও মিরিয়্যামের সন্ধান লয় নাই? তাও কি হয়? সন্ধান লইয়াছে বৈ কি? দগ্ধ দুর্গের একটা দিক্ এখনও য়ুদীদের অধিকারে ছিল; ক্যালেব সেইখানে প্রহরী ছিল; সে পলাইয়া বাহিরে আসিয়া একটী মৃত দেহ হইতে সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিল; আপনার পরিচ্ছদ শব-দেহে পরাইয়া দিল; তাহার পর এক ঝুড়ি ফলমূল টাট্‌কা কিনিয়া লইয়া ফলোৎপাদনকারী কৃষকের বেশে রোম্যান শিবির-মধ্যে প্রবেশ করিল। সন্ধানে জানিল যে, সেনাপতি গ্যালস্ মিরিয়্যাম্‌কে লইয়া টায়র গিয়াছেন, সেখান হইতে রোমে যাইবেন।

ক্যালেব যে দিন টায়র নগরে পৌঁছিল, সেই দিন দেখিতে পাইল, একখানি গরুৎমতী তরি হেলিতে দুলিতে বন্দর হইতে বেগে বাহির হইয়া যাইতেছে। অনুসন্ধানে জানিল, সেই খানিতেই গ্যালস্ ও মিরিয়্যাম্ আছে। ক্যালেব বিলম্বে ব্যথিত হইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে গুম্‌রাইতে লাগিল।

যুদ্ধের পূর্ব্বেই ক্যালেব আপনার ঘর বাড়ী ভূসম্পত্তি

বিক্রয় করিয়াছিল। হীরা জহরৎ কিনিয়া একটী প্রাচীন ভৃত্যের নিকট রাখিয়াছিল। ইহার পর, কৃষকবেশী ক্যালেবকে আর দেখা গেল না; ডিমিট্রিয়স নামে এক জন মিসর দেশীয় বণিক্ টায়রে বাণ্ট্রিকালে দেখা দিল; রোমে বাণিজ্য করিবার জন্য বহুতর সওদা নূতন বণিক্ ক্রয় করিয়া জাহাজে বোঝাই দিল। জাহাজে করিয়া নানা স্থানে বাণিজ্য করিয়া রোমের নিকটস্থ বন্দরে জাহাজ লাগিল; স্থলপথে সেই সমস্ত সওদা বণিকের সঙ্গে রোমে রওনা হইল।

(৭)

সমস্ত পাত্র-পাত্রী ক্রমে রোম নগরে আসিয়া জুটিয়াছে। রোমের দুটা কথা এখন বলিতে হয়।

রোম নগর তখন অতুল সমৃদ্ধি-সম্পন্ন। সে সমৃদ্ধি, বোধ করি, কখনও কোন নগরের হয় নাই। লণ্ডন নগর এখনকার দিনে অতুল সমৃদ্ধি-সম্পন্ন, কিন্তু সে কেবল বাণিজ্য-সম্পত্তি, প্রধানতঃ কল-কারখানা-কারবারের সমৃদ্ধি; রোমেরও তাহা ছিল, তবে বাণিজ্য এত ছিল না এবং এরূপ কল-কারখানাও হয় নাই। তবে রোমে ইন্দ্রভবন সদৃশ সুরম্য প্রাসাদ ছিল, অতুল্য দেবায়তন ছিল, মর্ম্মর চত্বর ছিল, কারুকার্য্য-শোভিত রঙ্গভূমি ছিল; আর

পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি, নৃশংসতার রঙ্গক্ষেত্র মল্লভূমি ছিল। রোমের সমৃদ্ধির এইগুলাই হইল কলঙ্ক।

গ্যালস্ রাত্রিকালে চুপে চুপে যাইয়া, আপনার নিভৃত ভবনে মিরিয়াম্‌কে আপনার বনিতার হস্তে অর্পণ করিলেন। মিরিয়্যামের সৌভাগ্যক্রমে তিনি খ্রীষ্টপন্থী, গ্যালস্ তাহা জানিতেন না। এখন জানিতে পারিয়া, রুষ্ট না হইয়া বরং হৃষ্ট হইলেন; বুঝিলেন মিরিয়্যামের পরিরক্ষণ ভালরূপেই হইবে। তা'ত হইতেছে, কিন্তু তা বলিয়া মিরিয়্যাম্ কি আনন্দে আছে? তাও কি কখনও হয়? যে, সময় আসিলেই দাসীরূপে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইবে, সে কখনই মনের শান্তি পাইতে পারে না। দুই একজন খ্রীষ্টান পাদরী গ্যালসের বাড়ীতে আসিতেন, নব ধর্ম্মের প্রাণ-ভরা উপাসনা হইত; শান্তির ছায়া পড়িত, কিন্তু পরক্ষণেই আবার আশঙ্কায় অশান্তি আসিত। দাসত্ব লাঞ্ছনার অবস্থা চির-কালই; কিন্তু দাসীত্বের আশঙ্কায় এমন মর্ম্মলাঞ্ছনা হয় যে, তাহাতে শান্তি তিষ্ঠিতেই পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেস্পেসিয়্যান্ এখন রোমের সম্রাট্। তাঁহার দুই পুত্র—একজন টাইটস্‌কে আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি; মিরিয়্যাম্ তাঁহার বন্দিনী। তাঁহার ভ্রাতা ডোমিশিয়ান্ এখন পিতার নিকট রোমেই আছেন। ডোমিশিয়ান্ উদ্ধত, গর্ব্বী,

স্বেচ্ছাচারী। একদিন বাতায়ন হইতে মিরিয়্যাম্ ডোমি-শিয়ানকে দেখিল, দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। গ্যালসের পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, এ কে গা ?" "কে আবার বাছা ! ও সেই হতভাগা ডোমিশিয়ান্।" মিরিয়্যাম্ হয়ত মনের মধ্যে ভাবিল—ঐ যদি আমাকে ক্রয় করে ?—মিরিয়্যাম্ থর থর কাঁপিতে লাগিল।

ভাল কথা—মারকস্ কোথায় ? গ্যালস্ বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই জানা গেল না—মারকস্ বা নেহুস্তা কোথায়।

ক্রমে এইরূপে ছয় মাসকাল গেল। টাইটস্ আসিলেন। বিজয়-গৌরবে রোম টল্‌মল করিতে লাগিল।

গ্যালসের উপর আদেশ হইল, মিরিয়্যাম্‌কে রাজসভায় হাজির করিতে। শুনিয়া মিরিয়্যাম্ কাঁপিল। গ্যালস্ বুঝাইয়া সুঝাইয়া মিরিয়্যাম্‌কে শিবিকা করিয়া রাজসভায় লইয়া গেলেন।

সভা দেওয়ান্-এ-আম নহে, দেওয়ান্-এ-খাস। দুই চারিটী কর্ম্মচারী ; মধ্যস্থলে সম্রাট্ বেস্পেসিয়্যান্, দুই পার্শ্বে দুই পুত্র—টাইটস্ ও ডোমিশিয়ান্। লজ্জাহীন ডোমিশিয়ান্ মোতিকুমারীকে পাইবার জন্য পিতার নিকট কত আবদার, আক্রোশ করিল, ভ্রাতার সঙ্গে রাগারাগি করিল ; কিছু

হইল না। টাইটস্ যে বলিয়াছিলেন, মিরিয়্যাম্ উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইবে। অনেকগুলি কুমারী ঐরূপে বিক্রীত হইবে। বিক্রয়-লব্ধ অর্থ আহত রুগ্ন সেনাদিগের পরিচর্য্যায় ব্যয়িত হইবে। সেই কথাই স্থির রহিল।

দেখিতে দেখিতে বিজয়োৎসবের দিন আসিল। বিজয়-পতাকায়, বিজয়-মাল্যে রোমের রাজপথ তোরণ-প্রাকার সমস্ত অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। বিজয়-ঘোষণার দুন্দুভি-নিনাদে সমগ্র নগর শব্দায়মান্ হইল। যে নির্দ্দিষ্ট রাজপথ দিয়া মিস্ল চলিবে, কেবল সে সকল রাজপথ নয়, সেই সকল পথের পার্শ্বস্থ গৃহদ্বার বাতায়ন প্রাসাদ প্রাতঃকাল হইতে লোকে পরিপূর্ণ হইল। সকলেই উৎকৃষ্ট সজ্জায় সজ্জীভূত। অশ্বারোহী নগরপালগণ অনবরত চারিদিকে অশ্বচালনা করিয়া লোক-সঙ্ঘকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে; গভীর জনতার মধ্য দিয়া অশ্বচালনা করিয়া, কীলক-প্রহারে যেমন দারুকাণ্ড দ্বিখণ্ড করে, তেমনি করিয়া জনতাকে বিভাগ করিতেছে, অশ্বারোহীরা চলিয়া গেলে, আবার জনতা জলরাশির মত মিশিয়া যাইতেছে।

অতি প্রত্যূষে গ্যালস্ মিরিয়্যামকে শিবিকায় লইয়া আইসিস্ দেবীর মন্দিরের পথে লইয়া যান; তখনও ঘোর ঘোর ছিল, নহিলে তাঁহারা দেখিতে পাইতেন, বিপুল শ্রমে

শ্রান্ত অশ্বদ্বয়োপরি দুই জন আরোহী সেই সময় অতি দ্রুত বেগে অশ্বচালনা করিয়া রোমে প্রবেশ করিল। দুই জনই পুরুষবেশী বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে এক জন যেন ছদ্ম-বেশিনী স্ত্রীলোক হইবে। ইহারাই মারকস্ ও নেহুস্তা।

নেহুস্তা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিও কি এই বিজয়োৎসবে যোগদান করিবেন?" মারকস্ কহিলেন, "কাহার সঙ্গে কোথায় যাইব?—"কেন টাইটসের পার্শ্বে—আপনি তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু।"

মারকস্ বলিলেন, "যাহারা শত্রু-হস্তে জীবন্ত বন্দী হয়, তাহাদের জন্য রোমের প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা। যদি মিরিয়াম্‌কে না দেখিতাম, আমি নিজেই আত্মহত্যা করিতাম; তাও পারি নাই; এখন রোম আমাকে অনুমতি না দিলে আমি রোমে প্রবেশ করিতেই পারি না।"

"তবে এখন কর্ত্তব্য কি?"

"কর্ত্তব্য—আমার নিভৃত নিবাসে গিয়া গোপনে দেখা —সেই পথে মিস্‌ল যাইবে,—দেখিব, মিরিয়াম্‌কে লইয়া যায় কিনা—না যায়, বুঝিবে, মিরিয়াম্ জীবিত নাই, বা তাহাকে আর কোথাও বিক্রয় করিয়াছে।"

আর কথা নাই—দুইটী অশ্ব পাশাপাশি চলিতে পারিল না, আগে পিছে হইয়া ক্রমে মারকসের ভবনের

সম্মুখে আসিল। ঘুরিয়া গলির দিকে খিড়কীর পথে গেল। মারকস্ অবতরণ করিলেন। অনেক ডাকাডাকির পর দুয়ার খুলিল।—প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী বিলম্বে প্রভুকে চিনিতে পারিল—আহ্লাদে অভ্যর্থনা করিল। মারকস্ তাহাকে স্নানাহারের জোগাড় করিতে বলিয়া সেই ভবনে অর্থ-সামর্থ্য কিরূপ আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ম্মচারী দেখিল, অপর ব্যক্তি ঘোড়ার তদ্বিরে দূরে ব্যস্ত আছে। চুপে চুপে বলিল, "অর্থের অসদ্ভাব হইবে না; এত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি যে, তত লইয়া কি করা যাইবে, স্থির করিতে পারি না।"

"বেশ, বেশ,—ত্রিশ ঘণ্টা ঘোড়ায় আসিতেছি—এখন খাবার জোগাড় কর।"

আহারাদির পর নেতুস্তা মারকসের নিকট আসিলে, মারকস জানিলেন যে, সেই দিন মিরিয়্যাম্‌কে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। আরও শুনিলেন, ডোমিশিয়ান্ মিরিয়্যাম্‌কে ক্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। "আমি যদি ডাক বাড়াইয়া অতি উচ্চ মূল্যেও মিরিয়্যাম্‌কে ক্রয় করিতে পারি, তথাপি ডোমিশিয়ানের কোপ হইতে আমার রক্ষা পাওয়া ভার।" "বিপদে পাড়বার পূর্ব্বে এত উতলা হইবার প্রয়োজন কি? আগে মিরিয়্যাম্‌কে ত হস্তগত করুন। দেখা যাক মিরিয়্যাম্‌কে বন্দিনীরূপে লইয়া যায় কিনা? সেইটী অগ্রের

কার্য্য।” পরে তাঁহারা বাতায়ন-পথে দাঁড়াইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

নেহুস্তা ও মারকস্ যাত্রি-মধ্যে মিরিয়্যাম্‌কে দেখিল। মিরিয়্যাম্ নেহুস্তাকে চিনিল। মারকস্ কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন, “মোতি-কুমারী কিরূপে কখন বিক্রীত হইবে, তাহার সমস্ত সঠিক সংবাদ গোপনে সংগ্রহ করিয়া আমাকে সন্ধ্যার মধ্যে সংবাদ দিবে; কেহ যেন কিছু জানিতে না পারে।” কর্ম্মচারী চলিয়া গেল।

* * *

সে সব কথায় আর কাজ কি? সুন্দরী যুবতী কুমারী-দিগকে লইয়া নিলামের সেই ডাক ডাকাডাকি—সে সব কথা নাই শুনিলেন, সে দৃশ্য নাই দেখিলেন। রোম গিয়াছে, এখন রোমের কলঙ্ক-কাহিনীর কথায় আর কাজ কি? রোম রাজকর্ম্মচারী দিয়া যে কাজ করাইত, এখনকার দিনে ভারতে অতি নীচ দালালেও তাহা করিতে লজ্জা বোধ করে।

ডোমিশিয়ানের কর্ম্মচারী ডাকিল, ডিমিট্রিয়স্ বণিক্ ডাকিল, নেহুস্তা সকলের অপেক্ষা উচ্চ মূল্যে—অসম্ভব মূল্যে ডাক খতম করাইয়া—গোপন-পথে মিরিয়্যাম্‌কে লইয়া মারকসের ভবনে প্রবেশ করিল; ডিমিট্রিয়স্ বণিক্ তখনই

তাহা সন্ধান রাখিল। অর্থাৎ সেই অভাগা ক্যালেব ইহা-দিগকে অনুসরণ করিয়াছিল।

মারকস্-মিরিয়্যামের দেখা সাক্ষাৎ হইল। মারকস্ প্রভূ—মিরিয়্যাম্ দাসী। আবার সেই মাতৃ-আজ্ঞা প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। মারকস্ মিরিয়্যাম্‌কে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিলেন। মিরিয়্যাম্‌কে লইয়া নেহুস্তা প্রভাতে চলিয়া যাইবে, স্থির হইল। মিরিয়্যামের মর্ম্ম বিদীর্ণ হইল, কিন্তু মাতৃ-আজ্ঞা পালনের প্রভা সেই ক্ষত-মর্ম্মে উজ্জ্বলীকৃতা হইল। প্রণয়-মিলনের অপেক্ষা মাতৃ-আজ্ঞা গরীয়সী—মহিমময়ী!

ক্যালেবের জীবনের দুইটী মাত্র লক্ষ্য ছিল—য়ুদীদের রাজা হইব, আর মিরিয়্যামকে রাণী করিব। রোম য়ুদীদের ছিন্ন ভিন্ন করিল; সুতরাং তাহাদের রাজা হওয়া হইল না। এখন মিরিয়্যাম্ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। ক্যালেব আপনার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল—কিন্তু সে পণে মিরিয়্যাম্‌কে পায় নাই। নেহুস্তা যতই ছদ্মবেশে থাকুক, ক্যালেব তাহাকে চিনিয়াছিল; সন্ধান করিয়া মারকসের বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। জানিত না যে, সেটা মারকসের বাড়ী। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সেই বাড়ীর পাহারায় রহিল। প্রভাতে শুনিল, সেটা মারকসের

বাড়ী; আরও শুনিল মারকস্ জীবিত নাই, কিন্তু শেষ কথাটা বিশ্বাস করিল না; মনে মনে মরাইতে লাগিল; আপনার আফিসে আসিল।

ক্যালেব আপনার আফিসে বিমনা বসিয়া আছে, এমন সময় ডোমিশিয়ানের লোক আসিল। ক্যালেব ডাক ডাকিয়াছিল; অবশ্য মোতিকুমারীর দিকে ঝোঁক ছিল; হয়ত কে ডাকিয়া লইয়া গেল, কোথায় লইয়া গেল, এ সকল বিষয় সন্ধান রাখে, এই বিশ্বাসে ডোমিশিয়ানের লোক আসিয়াছে। মারকসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। স্থির হইল ক্যালেব মারকস্‌কে ধরাইয়া দিবে; সে মিরিয়্যাম্‌কে পাইবে তাহার ধন-সম্পত্তি চায় না।

সমস্ত সৈন্য-বিভাগের কার্যোর ভার তাঁহার ভ্রাতা ডোমি-শিয়ানের হস্তে অর্পণ করিয়া টাইটস্ স্থানান্তরে নিভৃত বাস করিতেছেন। ডোমিশিয়ানের আদেশে মারকস্ যখন নিজ ভবনে গ্রেপ্তার হইলেন, তখন নেহুস্তা ও মিরিয়্যাম্ চলিয়া গিয়াছেন। মারকস্ বিচারের জন্য ডোমিশিয়ানের সম্মুখে নীত হইলেন; ক্যালেব তাঁহার বিরুদ্ধে 'সাক্ষ্য' দিতে আসিয়াছে। মারকসের চক্ষু ক্যালেবের উপর পড়িল; তিনি বুঝিলেন, এই পাপিষ্ঠ হইতেই এই কাণ্ড প্রধানতঃ হইয়াছে।

ডোমিশিয়ানের বিচারে মারকসের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা

হইল বটে, কিন্তু মারকস সম্রাট্ ভেস্পেসিয়্যানের কাছে আপীলের অনুমতি পাইলেন। আপাততঃ তিনি বন্দী হইয়া থাকিবেন।

নেহুস্তা ও মিরিয়্যাম্ প্রথমেই গ্যালসের বাড়ীতে গেলেন। গ্যালস্ আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে দিয়া তাঁহাদিগকে খ্রীষ্টানদের নিভৃত পল্লীতে পাঠাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ডোমিশিয়ানের লোকেরা তাঁহাদের খুঁজিতে আসিল; দেখা ত পাইল না, কোন অনুসন্ধানও পাইল না।

রোম বিস্তীর্ণ নগর; তাহার একদিকে একটা কদর্য্য ভাগে খ্রীষ্টানেরা বাস করিত। সকলেই মাটীর কাজ, কাঠের কাজ করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিত। সমস্ত উপার্জ্জন একত্র করিয়া বর্ষীয়ান্‌গণ সকলকে প্রয়োজন মত বিভাগ করিয়া দিতেন। কিয়দংশ বিপন্নের সাহায্যের জন্য রাখা হইত। যিনি শ্রেষ্ঠ পাদরী, তিনিও ছুতারের কার্য্য করিতেন। যীশুখ্রীষ্টের মর্ত্ত্য-পিতা ছুতার ছিলেন। মিরিয়্যাম্ মাটীর পঞ্চপাত্র, ঝাড় ও প্রদীপ তৈয়ার করিতেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এইরূপে সুখেই কাটিয়া যাইতে লাগিল।

পাদরী সূত্রধর-বেশে মারকসের নিকটে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তিনি মিরিয়্যামের সংবাদ দিতেন, আর নব-দেব

যীশুর অপূর্ব্ব জীবনবৃত্ত বিবৃত করিয়া মারকস্‌কে খ্রীষ্টধর্ম্মের অমৃতময়ী কথা শুনাইতেন। মারকস্ শুনিতেন, কিন্তু দীক্ষিত হইতে পারিলেন না। তাঁহার অর্থে গোপনে গোপনে একখানি জাহাজ ক্রয় করা হইল, বিশ্বস্ত খ্রীষ্টান মাঝিমাল্লা নিযুক্ত হইল। গ্যালস্ ও তাঁহার স্ত্রী তাঁহাদের সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া, মিরিয়্যাম্ ও নেহুস্তাকে সঙ্গে লইয়া সিরিয়া যাত্রা করিলেন। মারকস্ অবশ্য এ সকল সংবাদ পাইতেন।

মিরিয়্যামের অনুসন্ধানে ডোমিশিয়ান ব্যর্থ হইয়া ক্রমে শৈথিল্য দিয়াছেন। কিন্তু ক্যালেবের একটুও শৈথিল্য নাই। এটা ডোমিশিয়ানের একটা খেয়াল, কিন্তু ক্যালেবের হইল প্রাণের দায়; সে মিরিয়্যাম্‌কে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসিত। এই দুইমাস কাল ক্যালেব প্রতিনিয়ত গ্যালসের বাড়ী চৌকী দিয়াছে। জানিতে পারিয়াছে যে, গ্যালস্ সমস্ত বেচেকিনে জাহাজে করিয়া সিরিয়া মুলুকে যাইবেন; কিন্তু মিরিয়্যামেরা যে সঙ্গে যাইবে তাহা সে জানিতে পারে নাই। তাহারা রোমে আছে কিনা, তাহাও সে জানে না।

দৈবাৎ একদিন ক্যালেব একটা সূত্র পাইল। তাহার একটা দীপাধার ও দীপের প্রয়োজন ছিল। এক দোকানে গিয়া, একটা বিচিত্র দীপাধার দেখিল—একটা শিলাখণ্ডের

পার্শ্বে দুইটী তালগাছ জড়াজড়ি করিয়া উঠিয়াছে ; তালদ্বয়ের দুইটী পত্রবৃন্ত হইতে একটী শৃঙ্খল ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তাহাতেই একটী বিচিত্র দীপ ঝুলিতেছে। কারুকার্য্য অদ্ভুত। —দেখিতে দেখিতে সেই শৈশব-যৌবনের ঈষানী-ক্ষেত্র মনে পড়িল ; তেমনই জোড়া তাল তলায়, তেমনই শিলাখণ্ডে বসিয়া, ক্যালেব কর্দ্দমাক্ত জলে মাছ ধরিত, মনে পড়িল ; কিশোরী মিরিয়্যাম্‌কে চক্ষুর সমক্ষে দেখিতে লাগিল। সে সেইটী ক্রয় করিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কারিকর কোথাকার গা ?" "একজন খ্রীষ্টান পাদরী আমাদের পাইকের, তিনি গলির ভিতর অনেক গরীব দুঃখী কারিকর লইয়া বাস করেন।" সন্ধান করিয়া সেইখানে গেল ; একটী বালিকার কাছে শুনিল, কারিকর চৌতালার সিঁড়ির ঘরে আর একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাস করে।

রাত্রি পোহাইলেই জাহাজ ছাড়িবে, কিন্তু সন্ধ্যার সময় নেহুস্তা-মিরিয়্যামের সম্মুখে ক্যালেব উপস্থিত।

নেহুস্তা ডোমিশিয়ানের সহিত ক্যালেবের ষড়যন্ত্র সকলই জানিত ; সেই সকল কথা বলিয়া ক্যালেবকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিল। মিরিয়্যাম্ বলিল, "জানি তুমি আমাদের সমস্ত পণ্ড করিতে পার, সেই ভয়ে যে তোমার কোন কথা শুনিব, তাহা শুনিব না ; মারকসের ক্ষতি করিতে চাও কর, কিন্তু

তুমি আমাকে পাইবে না। তুমি আমাকে ভালবাস তাহা জানি, কিন্তু আমি তোমাকে কখনও ভালবাসি নাই। মারকস্‌কে ভালবাসি কিন্তু খ্রীষ্টান নয় বলিয়া তাহাকে বিবাহ করি নাই—তুমি নিতান্ত বাতুল তাই আমার প্রত্যাশা কর।"

বলিতে বলিতে মিরিয়্যাম্ লাবণ্যময়ী লতার মত বাতায়ন-বেদীতে ঢলিয়া পড়িল; ক্যালেব একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অস্ফুট স্বরে বলিল—"আমি পারিব না।" এইবার মিরিয়্যাম্ ক্যালেবের দিকে এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।

ক্যালেব বলিতে লাগিল, "মিরিয়্যাম্! শৈশবে, কৈশোরে, —যখন তোমাকে ভাল বাসিয়াছিলাম, তখন সেই ভালবাসায় স্বর্গের সুখ পাইতাম। তখন তোমার প্রতি লোভ হয় নাই। যখন লোভের উদয় হইল, তখন এই হৃদয়ে স্বর্গ-নরক সমানে অধিকার করিল। নরকের বিষ— মারকসের দিকে বর্ষিত হইতে লাগিল। এই স্বর্গ-নরক লইয়া এতদিন কাটাইয়াছি। অদ্য তোমার কথায় আমার নরকের মোহ কাটিল। আমি তোমাকে পাইবার চেষ্টা আর করিব না, মারকসের অনিষ্ট চেষ্টাও করিব না,—যাহাতে তাঁহার মঙ্গল হয়, সে চেষ্টা করিব। তোমার সরলতায়

আমি নরক হইতে রক্ষা পাইলাম। মিরিয়্যাম্, এই শেষ দেখা—।”

নামিতে গিয়া ক্যালেব পা পিছলাইয়া ভাঙ্গা সিঁড়িতে পড়িয়া গেল। নেহুস্তা অমনি তাহাকে বধ করিতে উদ্যতা; বস্ত্র-মধ্যে অস্ত্র নেহুস্তা বরাবরই রাখিত।

মিরিয়্যাম্ নেহুস্তাকে নিরস্ত করিলেন; বলিলেন, “উহাকে ছুরি মারিবে—কি তোমাকে ধরাইয়া দিব,—হয় হোক আমাকে ডোমিশিয়ানের সম্মুখে যাইতে।” নেহুস্তা বলিল, “নির্ব্বোধ, উহার কথায় বিশ্বাস করিলি—সমস্ত পণ্ড করিলি!” ক্যালেব উঠিয়া বলিল, “নেহুস্তা, আমাকে মারিলেই সমস্ত পণ্ড হইত। নেহুস্তা, তুমি বৃদ্ধা হইয়াছ কিন্তু স্বর্গ-নরকের খেলা বুঝিতে পারিলে না।” ক্যালেব এবার মিরিয়্যামের হস্ত চুম্বন করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইল; বিদ্যুতের মত চলিয়া গেল।

ক্যালেব তাহার কথা রক্ষা করিয়াছিল। মিরিয়্যাম্, নেহুস্তা, গ্যালস্ ও তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া ছোট জাহাজখানি সমুদ্র যাত্রা করিল।

এই ঘটনার সপ্তাহ মধ্যেই টাইটস্ রোমে ফিরিয়া আসিলেন। মারকসের আপীল তাঁহার কাছে উঠিল। তিনি রায় দিলেন যে, মারকস্ পরম সাহসী বীরপুরুষ; তবে

রোমের নিয়ম যখন তিনি লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং ডোমিশিয়ান যখন তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন, তখন তিনি দোষী বটেন। তিনি সপ্তাহ-মধ্যে ইটালী দেশ ত্যাগ করিয়া তিন বৎসর দেশান্তরে থাকিবেন, তাহার পর রোমে ফিরিয়া আসিবেন। অদ্যই তিনি কারামুক্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে আপন ভবনে নীত হইবেন।

পাপিষ্ঠ ডোমিশিয়ান পূর্ব্বেই মিরিয়্যাম্‌কে পাওয়া সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছিল, তাহার পর টাইটসের এই আদেশ তাহাকে বিষের মত বোধ হইল; সঙ্গে সঙ্গে শুনিল যে, মিরিয়্যাম্ জাহাজ-ডুবিতে মারা পড়িয়াছে—রাগে ক্ষোভে গুপ্ত ঘাতক দ্বারা সেই সন্ধ্যাকালেই মারকস্‌কে হত্যা করিতে সঙ্কল্প করিল।

ক্যালেব এই সংবাদ ডোমিশিয়ানের কর্ম্মচারীর নিকট হইতে জানিতে পারিলেন। ক্যালেবই জাহাজ-ডুবির সংবাদ সর্ব্বাগ্রে জানিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ক্যালেব দুইখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া, রোমান পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া, স্বীয় ভবন হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ইহার কিছু পূর্ব্বে খ্রীষ্টান পাদরী মারকসের সহিত দেখা করিতে সেই কারা-উদ্যানে গেলেন। দেখেন মারকস্ আত্মহত্যা করিবার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করিতেছেন। মনে

করিলেন,—মিরিয়্যামের মৃত্যু-সংবাদেই মারকস্ এইরূপ বিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু মারকস্ বাস্তবিক তখন পর্য্যন্ত জাহাজ-ডুবির কথা কিছুই জানিতেন না,—তিনি টাইটসের বিচারে বিক্ষুব্ধ হইয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ করিতেছিলেন মাত্র। পাদরী-পুঙ্গব তাঁহাকে ওরূপ পাপের কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন; বলিলেন, "মারকস্, তুমি, সম্পদে খ্রীষ্টকে চিনিতে পার নাই, এখন বিপৎকালে তাঁহার চরিত চিন্তা কর; তিনি দয়াময়, তোমার উদ্ধার করিবেন।"

মারকস্ বলিলেন, "এই কয়মাস তাঁহার চরিত ধ্যান করিয়া বেশ বুঝিয়াছি—তিনি দয়াময়, তাঁহার দয়া অসীম; কিন্তু এতদিন যে তাঁহার উপাসক হই নাই, তাহার কারণ ছিল; আমি খ্রীষ্টান হইলে মিরিয়্যাম্ মনে করিত, আপনিও মনে করিতেন, এমন কি আমিও মনে করিতাম যে, মিরিয়্যা-মের জন্যই আমি খ্রীষ্টান হইয়াছি। এখন সে ভাবনা আর নাই—মিরিয়্যাম্ ইহলোকে নাই,—সুতরাং এখন তাঁহার পদাশ্রয়ে আমার আর বাধা কি?"

পাদরী মহা প্রীত হইয়া সেই স্থানে তখনই জল-অভি-ষেকে মারকস্‌কে খ্রীষ্ট উপাসনায় দীক্ষিত করিলেন। উভয়ে মারকসের ভবনে যাত্রা করিলেন। কারারক্ষী দুইজন সঙ্গে

গেল মাত্র, কেহই নিবারণ করিল না। টাইটসের আদেশই সেইরূপ ছিল।

মারকস্ ও পাদরী মারকসের ভবনে প্রবেশ করিলেন। সদর দ্বার খোলা রহিয়াছে। প্রবেশ-পথে একটা শব-দেহের মত কিছু পায়ে ঠেকিল। বরাবরই দ্বার খোলা, ঘরের মধ্যে লৌহ-সিন্দুক ভাঙ্গা, কর্ম্মচারী এবং পরিচারিকা বাঁধা রহিয়াছে। এ ত বিষম ব্যাপার! দুইজনেই জীবিত—বন্ধন খোলা হইলে সুস্থ হইয়া কর্ম্মচারী বলিল যে, বণিক্ ডিমিট্রিয়সের প্রেরিত দস্যু আসিয়া তাহাদের দুর্দ্দশা করিয়াছে, আর ধনরত্ন লইয়া গিয়াছে। তাহারা মনে করিয়াছিল, দুয়ারে তাহারা মারকস্‌কে হত্যা করিয়াছে; কিন্তু আলোক লইয়া দেখা গেল, ক্যালেবের মৃত দেহ! একজন হরকরা ক্যালেবের পত্র মারকস্‌কে দিল—তাহাতে ক্যালেব লিখিয়াছে, "ডোমিশিয়ান আজি তোমাকে তোমার দুয়ার-পথে মারিবার জন্য ঘাতুক নিযুক্ত করিয়াছে। আমি তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য, আর মিরিয়্যামের কাছে তোমার অগ্রে পৌঁছিবার জন্য সাজিয়া বাহির হইলাম। বোধ হয় ঘাতুকদের হস্তে আমার মৃত্যু হইবে। মারকস্, অনেক রেষারেষি করিয়াছি—ক্ষমা করিও।"

পত্র পাঠ করিয়া ক্যালেবের মহত্ত্বে দুই জনেই অবাক্

হইলেন। মারকসের রোম পরিত্যাগের উদ্যোগ হইল। মারকস্ না মরিয়া ক্যালেব মরিয়াছে —একথা ডোমিশিয়ান জানিবার পূর্ব্বেই পলাইতে হইবে।

পরদিন প্রত্যুষেই মারকস্ এবং পাদরী সম্ভই ছাড়িবে এমন একখানি জাহাজে আরোহী হইলেন। জাহাজ মিসরে সেকেন্দ্রা সহরে যাইবে। জাহাজ সময়ে ছাড়িল বটে, কিন্তু ঝড় তুফান কাটাইয়া বন্দরে বন্দরে থামিয়া সেকেন্দ্রা সহরে পৌঁছিতে তিন মাস লাগিল। তখন জাহাজে জল ফুরাইয়াছে, খাদ্য ফুরাইয়াছে, কষ্টের একশেষ হইয়াছে। দেখা গেল আর একখানি জাহাজ বন্দরে নোঙ্গর করিয়া রহিয়াছে। যদি একটু জল পাওয়া যায়, ত এই দারুণ তৃষ্ণা হইতে রক্ষা হয়, ভাবিয়া একখানি জালিবোট ভাসাইয়া সেই জাহাজের পার্শ্বে পাদরী ও মারকস্ গেলেন, সেখানি খ্রীষ্টানদের জাহাজ। ইঁহাদিগকে খ্রীষ্টান দেখিয়া জাহাজের উপরে উঠিতে দিল।

উভয়ে শুনিতে পাইলেন মধুরকণ্ঠে গীত হইতেছে,—

ভালবাসে যেই জন
তা'র হয় না মরণ ;
যতই লাঞ্ছনা হোক, শেষে অবশ্য মিলন।

কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া উভয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাম্নি

করিতে লাগিলেন—চেনা স্বর নয়? যেখানে গান হইতেছিল, সেইখানে উভয়ে গেলেন—গায়িকা মিরিয়্যাম্ মারকস্‌কে দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন।

মিরিয়্যামের জাহাজ-ডুবির সংবাদ মিথ্যা—জাহাজখানা বিপদে পড়িয়াছিল বটে। সেই রাত্রিতে পূর্ব্ব কথা সকলই হইল—ক্যালেবের মৃত্যুর কথা মিরিয়্যাম্ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন না; লাঞ্ছনা-যন্ত্রণার মধ্যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল-বিধান সকলেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন।

পরদিন পাদরী-পুঙ্গব পৌরহিত্য করিলেন; গ্যালস্ মিরিয়্যামকে মারকস্-করে সম্প্রদান করিলেন; পলিতকেশী ভ্রূকুটি-নয়না নেহুস্তা মিরিয়্যামের মাতৃনামে নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিল। ইংরাজি গ্রন্থে লেখা নাই, আমরা কিন্তু বলিতেছি দুর্গ জাহাজে খুব ভোজের ধুম হইয়াছিল; নেহুস্তা নাকি নাচিয়াছিল।



হলধর ঘটক

হলধর ঘটক বড় তৈয়ার লোক ছিলেন। আয়-উপায় যৎসামান্য, কিন্তু তাহাতেই সদা প্রফুল্ল; তবে, "ছি বাবা!" বলিয়া কখন কখন চটিয়া উঠিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রফুল্লতা নষ্ট হইত না। তিনি সর্ব্বদাই হাস্য-বদন; কিন্তু সেই হাস্যের সঙ্গে শ্লেষ যেন সর্ব্বদাই মাখান রহিয়াছে। কথায় তিনি তুখড়। তিনি বলিতেন যে, কথা কাটাইতেই মনুষ্য-জন্ম, তা কথায় হটিলে মনুষ্যত্ব থাকে কৈ?

হলধর খুড়োর অনেক কাহিনী আমরা জানি, কিন্তু সামান্য লোকের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সভ্য-রীতির বিরুদ্ধ; কাজেই আমরা সকল কথা বলিব না। তবে গোটাকতক কথা না বলিয়াও থাকা যায় না।

দেশ-ভ্রমণ হলধর খুড়োর একটা রোগ ছিল। এখনকার মত তখন এত রেলপথ হয় নাই, সুতরাং পদব্রজে কেবল এ গ্রাম ও গ্রাম করিয়া বেড়াইতেন। শুধু শুধু ত আর

দেশ-ভ্রমণ হয় না, লোককে বুঝান দায় ; তা'র উপর তেমন সংস্থানই বা কৈ ? কাজেই হলধর খুড়ো ঘটকালির একটা অছিলা করিয়াছিলেন। সেই অছিলায় বহুতর ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল। আমাদের পাঠকগণের মধ্যে কাহারও না কাহার অবশ্যই তাঁহাকে স্মরণ আছে।

প্রথম রেল হইতেই হলধর খুড়ো বর্দ্ধমানে উপস্থিত। ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া ব্রাহ্মণ-মিঠাইওয়ালার দোকানের সম্মুখে দণ্ডায়মান। বড় বড় খাজার দাম চারি পয়সা করিয়া ; অতি অল্পই আছে, কয়জন খরিদ্দার বাছিয়া গুছিয়া বড় বড় দেখিয়া লইয়া গেল। হলধর খুড়ো বলিলেন, "একখানা চারি পয়সার খাজা দাও ত বাবা।" মিঠাইওয়ালা সেই বাছ-পড়া খাজা হইতে একখানা দিল। খুড়ো বলিলেন,—"এ যে বড় ছোট হে বাপু!" মিঠাইওয়ালা বলিল, "তাতে ক্ষতি কি ? তোমায় বেশী বহিতে হইল না, ভালই ত।" খুড়ো আর দ্বিতীয় কথা কহিলেন না, পকেট হইতে তিনটী পয়সা বাহির করিয়া ময়রার হাতে দিলেন! ময়রা বলিল, "মহাশয়, তিনটে দিলেন যে ?" খুড়ো বলিলেন, "তাতে ক্ষতি কি ? বেশী গুণতে হইল না, ভালই ত।" মিঠাই-ওয়ালা একটা মোড়া বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "তামাক ইচ্ছা করিবেন না ?" সেই হইতে মিঠাইওয়ালা ব্রাহ্মণের

সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইল; যখনই বৰ্দ্ধমানে যাইতেন, তাহার কাছে একদিন থাকিতে হইত।

হলধর খুড়ো রাজবাড়ী দেখিতে গেলেন। বড় বৈঠক-খানায় (এখন তাহা ভাঙ্গিয়া মহাতাপ-মঞ্জিল হইয়াছে) সারি সারি রাজার পূর্ব্ব পুরুষদের চেহারা টাঙ্গান রহিয়াছে। প্রথমে আদি পুরুষের, তাহার পর তাঁহার পুত্রের, তাহার পর তাঁহার পৌত্রের ছবি কুলজিনামা অনুসারে সাজান রহিয়াছে। একখানি ছবিতে বেশ নধর সুন্দর গোলাল গোলাল একটী ছেলের মাথায় জরির তাজ, তাহার পরের খানিতে শাদা চোগোপ্পা, কপালে বয়সের ত্রিবলী। হলধর খুড়োর সঙ্গে পল্লীগ্রামের একটা লোক সব ছবিগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতেছিল। এই দুইখানি ছবি দেখিয়া বলিল, "মহাশয়, এ যে ছেলের বয়স বাপের বয়সের চেয়ে বেশী দেখিতেছি গা?" হলধর খুড়ো বলিলেন, "তবে বুঝি পোষ্য পুত্র হইবে।" সে লোকটা বলিল, "তাই হবে।"

হলধর খুড়ো সহরে বেড়াইতেছেন; রাজবাড়ীর বড় গাড়ী চারিদিকে খড়খড়ি আঁটা, গড়গড় করিয়া চলিয়া গেল। একজন বলিল,—"যেন মড়া ফেলিবার গাড়ী করিয়াছে" আর একজন বলিল, "মেয়েদের জন্য গাড়ী ঐরূপই ত হবে।" হলধর খুড়ো বলিলেন, "তবেই হ'ল!"

হলধর খুড়ো মাহেশের স্নান-যাত্রা দেখিতে আসিয়া বৃহৎ একটা কাঁটাল কিনিয়াছিলেন। বড় রাস্তা দিয়া যাইতেছেন কাঁটালটা আর বহিয়া লইয়া যাইতে পারেন না। হন্ হন্ করিয়া একখানা ফেরৎ গোরুর গাড়ী যাইতেছে। হলধর গাড়োয়ানকে বলিলেন, "বাবা, আমার এই কাঁটালটা তোর গাড়ীতে যদি নিস্—বইতে আর পারি না।" গাড়োয়ান বলিল, "তা ত নেলাম, তুমি গাড়ীর সঙ্গে আসতে পারবা কি?" হলধর বলিলেন, "আমিও কাঁটালের সঙ্গে চেপে লব।" গাড়োয়ান হলধরের মুখের দিকে একবার দেখিয়া স্বীকার করিল। সেই অবধি হলধরে মামজুতে বড় প্রণয় হয়।

কিছুকাল পরে দেনার দায়ে মামজু গাড়োয়ানের দেওয়ানী জেল হইল। মামজু গাড়োয়ান খুব মর্দ্দ, খায়ও তেমনি। ডিক্রীদারকে রোজ চারি আনা মামজুর খোরাকী দিতে হয়। এমনই করিয়া প্রায় এক মাস গেল। ডিক্রীদারের বিশ্বাস যে মামজুর কিছু আছে। হলধর খুড়ো মামজুর ঘরের খবর বেশ জানিতেন; প্রথমেই ডিক্রীদারকে বলেন, সে তাহা বিশ্বাস করে নাই। একমাস পরে হলধর খুড়ো ডিক্রীদারের বাটীতে উপস্থিত; অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "রায় মহাশয়! এমন করিয়া দিন চারি আনা

করিয়া পয়সা আর কত দিন দিবেন ? ইহাতে আপনারও ত ক্ষতি, মামজুর পরিবারদেরও ক্লেশ। আমি একটা ঠাহরিয়াছি, সেইরূপ বন্দোবস্ত করুন।" ডিক্রীদারের মুখ চক্ চক্ করিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, এতদিনে তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল—টাকার একটা কিনারা হইবে। উত্তরে হলধর খুড়োকে বলিলেন, "ভালই ত ; যা হউক একটা বন্দোবস্ত কর না। একটা লোক জেলে থাকে, তাকি আমার সাধ ?" হলধর খুড়ো বলিলেন, "আমিও তাই বলি আপনি মামজুকে খালাস দিয়া দিন। তাহাকে ছয় পয়সা করিয়া দিবেন, আর বাকি দশ পয়সা আপনার দেনার হিসাবে কাটিয়া লইবেন। কেমন, এ বন্দোবস্ত ভাল নহে কি ?" ডিক্রীদার একটু হাসিলেন। তিনি আর খোরাকীর টাকা জমা দিলেন না। মামজু খালাস হইয়া আসিল।

হলধর খুড়ো যাত্রা শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যাত্রা শুনিবার জন্য তিন চারি ক্রোশ পথ হাঁটা তাঁহার গায়েই লাগিত না। সকল অধিকারীর সঙ্গেই তাঁহার আলাপ ছিল ; দলের অধিকাংশ ছেলেও তাঁহাকে চিনিত। সেবার গোপীনাথপুরে বদন অধিকারীর দল যাত্রা করিতে আসিল ; সেই সময় হলধর খুড়ো সেই খানে। ভাগাভাগি করিয়া কয় ঘর ব্রাহ্মণের বাড়ী দলের লোকের

মধ্যাহ্নের বন্দোবস্ত হইয়াছে। চারি পাঁচটী ফুট্‌ফুটে ছেলে এক বাড়ীতে তিনটার সময়ে আহার করিতে বসিয়াছে। হলধর খুড়ো হুঁকা হাতে করিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন; প্রাচীনা বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা পরিবেশন করিতেছেন। বয়োজ্যেষ্ঠ বালককে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, তোমরা এত রোগা কেন?"

বালক। মা, নিত্য রাত্রি-জাগরণে কি আর শরীর থাকে?

ব্রাহ্মণী। বাছা, তা তোমরা কি পাও?

বালক। কি পাব মা? এ বেলা এই তোমার এখানে প্রসাদ পাইলাম, রাত্রিতে চারিটী জলপান। আর পালে পার্ব্বণে টাকাটা সিকেটা পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণী। যদি পাওয়া থোওয়া নাই, তবে এত কষ্ট কর কেন?

বালক উত্তর দিতে পারিল না, নীরব রহিল। হলধর একমনে উত্তর-প্রত্যুত্তর শুনিতেছিলেন। এতক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ-কন্যার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"তা দিদি, বিদ্যা শিখিয়াছে, জাহির করিতে ত হইবে!" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "তা বটে।" তখন এত বাঙ্গালা খবরের কাগজ হয় নাই, এত কাগজওয়ালাও ছিলেন না,—থাকিলে

হলধর খুড়ো ঐ কথাই বলিতেন,—"বিদ্যে শিখেছে, জাহির করিবে না!"

হলধর খুড়োর সর্ব্বত্রই গতিবিধি ছিল; তবে তিনি আইন-আদালতের বড় ভয় করিতেন। ১৯ আইন জারি হইলে, হলধর খুড়ো প্রায় মাসাবধিকাল বিষণ্ণ ছিলেন। ইহার পূর্ব্বে এত দীর্ঘকালের জন্য তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদ কখনই জায়গা পায় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বারই তাঁহাকে সাক্ষ্য দিতে যাইতে হয়। তখন ইংরাজিওয়ালা উকিলের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। চেরা করিয়া বুকে উড়ানী দেওয়া শামলা-মস্তক জীবশ্রেণীর সেই প্রথম অভ্যুদয়ের কাল। উকিলবাবু চক্ষু কটমট করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, তোমার কাছ থেকে সেই জায়গা ঠিক কতদূর বল দেখি?" হলধর খুড়ো ধীর শান্তভাবে উত্তর করিলেন, 'দশ হাত দশ আঙ্গুল।" উকিলবাবু এবার হাসিয়া গ্রীবা বক্র করিয়া বলিলেন,—"এত ঠিকঠাক জানিলে কি করিয়া?" হলধর খুড়ো পূর্ব্বমত বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—"দুষ্ট লোকে সওয়াল করিবে বলিয়া মেপেছিলাম।" হাকিম গোপীনাথবাবুর সহিত সেই অবধি হলধর খুড়োর আত্মীয়তা হয়। গোপীনাথবাবু এজলাসে আপনার সম্মুখে হলধরবাবুকে বসাইয়া রাখিলেন। মধ্যে মধ্যে একটী

আধটা কথা চলিতে লাগিল। এমন সময় পুলিশের এক দারোগাবাবু সাক্ষ্য দিতে আসিলেন। মোকদ্দমা পুলিসের সংসৃষ্ট নয়। তবু দারোগাবাবু সোঁসাজে আসিয়াছেন; ভাবটা আপনার গৌরব দেখান। আবার সেই উকিলবাবু জেরা করিতে আসিলেন। তিনি দারোগাবাবুর পরিচ্ছদের উপর লক্ষ্য করিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া সওয়াল করিলেন, "মহাশয়, হাঙ্গার কিরীচ লইয়া সাক্ষী দিতে আসিয়াছেন কেন?" দারোগাবাবু সে সওয়ালের কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, হলধর খুড়ো হাকিমবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তা বাবুদের কাছে আসিতে হইলে আপ্তসার করিয়া আসিতে হয় বৈ কি। আমি গরীব ব্রাহ্মণ, আমাকেও রাম-কবচটা পরিয়া আসিতে হইয়াছে।" উকিলবাবু একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "প্রথম আলাপেই এত! আপনার দেখিতেছি খুব সৌজন্যতা।" হলধর খুড়ো আপনার সেই মৌরষি হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বাবুজি! অনর্থক কথা বাড়ান কেন?" উকিলবাবু সিনিয়ার ছাত্র; কোকিলের 'ফেমিনিন' 'মেদী কোকিল' লিখিয়া বাঙ্গালায় পাশ হন। হলধর খুড়ো টোলে বসিয়া তামাক খাইতেন মাত্র; শুনিয়াছিলেন যে, 'সৌজন্য' কথার উপর আর 'তা' কথা হয় না।

উকিল, ডাক্তার উভয়ের উপরেই হলধর খুড়োর সমান ভক্তি ছিল! তিনি ডাক্তারদের কথা উঠিলে বলিতেন,—"যাহারা বাড়ীতে পা দিয়াই তোমাকে জিহ্বা বাহির করিয়া কালী হইতে বলে, তাহারা যে তোমাকে কালের উপরে সমর্পণ করিতে ব্যগ্র, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে।" একবার গোপীনাথবাবুর সামান্য পীড়া হয়; ঔষধ খাওয়াইবার জন্য ডাক্তারবাবুর জেদাজেদি। শেষে তিনি বলিলেন, "আপনি খান, উপকার না হয়, আমি আর আপনার বাড়ীতে চিকিৎসা করিব না।" হলধর খুড়ো বলিলেন,—'তবে আপনাকে ঔষধ খাইতেই হইতেছে; যেরূপ বন্দোবস্ত হইল, তাহাতে এ দিকে না হয় ও দিকে উপকার হতেই হবে।"

বাপ-পিতামহকে লইয়া লুকোচুরি, দোকানদারি—খুড়ো দুই-ই দেখিতে পারিতেন না। পূর্ব্ব পুরুষদের পরিচয়েই যাহাদের পরিচয়, নিজের পরিচয় দিবার কিছু নাই, তাহাদিগকে খুড়ো বলিতেন—"মুদ্দোফরাস।"—বলিতেন, উহাদের সমস্ত পুঁজিই শ্মশানে; শ্মশানের সমস্ত সম্বল লইয়াই উহাদের ব্যবসা। আবার দীনদয়াল বড় দুঃখী ছিল; ছেলের চাকরি হওয়ায় কিছু বারফট্‌কাই আরম্ভ করে। হলধর খুড়ো একদিন একখানি পুরাতন কাশ্মীরী

শাল গায়ে দিয়াছিলেন দেখিয়া দীনদয়াল বলে, "কি বাবা, বৃদ্ধপিতামহের আমলের বমাল বাহির করিয়াছ যে।"—খুড়ো উত্তর দেন, "ছেলের আমলের চেয়ে ভাল ত?"

হলধর খুড়োর গল্প আর কত বলিব—সে এক গঙ্গা। তেমনই কল কল, ছল ছল; একদিকে তাহার ধস্ ভাঙ্গে, অন্যদিকে চড়া পড়ে,—তাহাতে কত মাটী ময়লা হয়, আবার কত ফুলবিল্বপত্র ভাসে। তোমরা তাহার সব কথা শু'নতে পারিবে কি? হলধর খুড়োর কাহিনীতে দেশ-উদ্ধার নাই, বক্তৃতা নাই,—তোমাদের সাক্ষাতে আমাদের বলিতেই লজ্জা করে, তা তোমাদের শুনিতে লজ্জা করিবে না?

তবে হলধর খুড়োর কাছে এমন অনেক জিনিষ ছিল বটে যে, সে সকল চিরকালই উপদেষ্টাদিগের পক্ষে উপদেশ হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার ভাষা ও ভঙ্গি ভেদ করা অনেক সময় কঠিন। এক দিনকার একটা গল্প বলি—

বলরামপুরের বিজয়বাবুর বড় বেশী বিষয় আশয় নয়—চারি পাঁচ হাজার টাকার মধ্যেই; অথচ ক্রিয়া-কাণ্ড, দান-ধ্যান, লোক-লৌকতায় বড় বড় বড়মানুষেরাও তাঁহার মত যশ লইতে পারেন না। একদিন হলধর খুড়োর সাক্ষাতে সেই কথার উত্থাপন হইয়াছিল। অনেকেই বলিলেন যে,

কিরূপে যে বিজয়বাবুর ওরূপ চালচলনে চলে, তাহা কিছুতেই বুঝা যায় না। হলধর খুড়ো বলিলেন,—"বিজয়-বাবু যে আপনার বিষয়কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আবার চাকরি করিয়া থাকেন।" একজন বলিলেন,—"তা ত এতদিন জানি না ; তাইত বটে, তা নইলে কুলায় কোথা হইতে ? তা কোথায় চাকরি করেন ?" হলধর খুড়ো বলিলেন,—"তিনি নিজের বাড়ীতেই মুহুরিগিরি করিয়া থাকেন।" তখন সকলে বুঝিল। আমাদের বিষয়ী পাঠকবর্গ-মধ্যে কেহ বুঝিলেন কি ? যদি কার্য্যত বুঝেন, তবে তাহাই অদ্য আমাদের বিদায়ী দর্শনী। ইতি।

বদরসিক

বেতালা, বেসুরো বদ্‌রসিকের দল দিন দিন বড় বাড়িতেছে; আমাদের আর ভদ্রস্থতা নাই। সেকালের মত সদানন্দ লোক প্রায়ই দেখা যায় না; সেই চোখ-ভরা চাহনি, গাল-ভরা হাসি, প্রাণ-ভরা খুসি, তেমন মজ্‌লিস্‌-ভরা লোক, কৈ আর ত প্রায়ই দেখিতে পাই না। এখন দেখিতে পাই—কেবল কতকগুলা হিংসে-ভরা, রগ্‌চেপা, ক্রূর-কটাক্ষ, বিষদিগ্ধ, বেতালা বেসুরো বদ্‌রসিক।

হচ্চে হেমবাবুর কবিতার কথা—সেই বিষয়ে ভাল-মন্দ যাহা ইচ্ছা হয় বল, বড় রসিক বলিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন হয়,

'বঙ্গের বিধবা বিনা মধু কোথা কুসুমে'—

ইত্যাদি আওড়াইয়া দুটা রঙ্গ-রসের ব্যঙ্গ কর; না হয় বল—হেমবাবু বাঙ্গালির পিণ্ডর, রসের ভাণ্ডার, কবিকুল-গণ্ডার—তা নয়, মাঝে হইতে তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, এবার

দুর্ভিক্ষে বর্দ্ধমান জেলায় কয়জন লোক মরিল? লও, একেবারে 'ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব'চাল্পবিষয়ামতিঃ'—কোথায় হেমবাবুর কবিতা, আর কোথায় বর্দ্ধমানের দুর্ভিক্ষ,—একেবারে মহারাণী হইতে বঙাল-গিন্নী। এমন বেতালা বদ্‌রসিক এখন অলিতে গলিতে। এদের জ্বালায় কোথাও বাঙ্-নিষ্পত্তি করিবার যো নাই।

কতকগুলা আছে, তাহাদের আবার আপন কথাই পাঁচ কাহন। যে সকল গল্প তিন পুরুষ শুনিয়া আসিতেছি, সেইগুলা থামকা বলিতে থাকিবে; তাই যদি গুছাইয়া বলিতে পারে, তাহা হইলে আপত্তি কি? তা কৈ? চিবাইয়া চিবাইয়া বলিবে, আগাগোড়া উলট্-পালট্ করিবে, আর যেখানটা গল্পের জান্, সেইখানটাই ভুলিয়া যাইবে। বদ্‌রসিকের গল্প এইরূপ:—

"কৃষ্ণনগরের রাজার বাড়ীতে, জান, অনেক দিনের কথা—জান, গোপাল ভাট নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিল। তাহার দুই স্ত্রী ছিল; তা জান, তার ছোট স্ত্রী বড় সুন্দরী। গোপাল ভাট বড় উপস্থিত বাগ্মী ছিল। তা জান, রাজা একদিন সেই ছোট স্ত্রীর কথা মনে করিয়া বলিলেন, 'ভাট জী, তোমাদের ওথানে নাকি বৌ বিক্রী হয়?'—ভাটের উপস্থিত কবিতা, ভাট বলিল,—'তা

৫

হয় বৈকি।' * এই ত গল্পের শ্রী : তাহার উপর তৎক্ষণাৎ একখানা ভয়ানক হাসির ঘটা,—স্থূল জিহ্বা উল্টাইয়া তালুর কাছে লইয়া গিয়া, বদন ব্যাদান করিয়া বটব্যালের মত একটা বিকটাকার হাসি। হাসির সেই ব্যালোল তরঙ্গে তখন সেই রস-ঘাতুকের উপর ঘৃণা ভাসিয়া যায়; বাতুলের বিকৃতিতে আমাদের পশু-প্রকৃতি যেমন মধ্যে মধ্যে হাসিয়া উঠে, সম্মুখের সেই বিকৃতি দেখিয়াও তখন আমরা সেইরূপ হাসি হাসিয়া উঠি! বদ্‌রসিক মনে করে, বড় রসিকতাই বুঝি হইয়াছে।

বদ্‌রসিকের গল্পও যেমন, গানও তেমনই। বিবাহ-বাসরে গান করিবে,—

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর—
অন্যে কথা কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।

---

* গল্পটা শাস্ত্রোক্ত মত এইরূপ :—

উলার মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায়কে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বৈবাহিক বলিতেন; বৈবাহিক সম্পর্কে তাঁহার সহিত রসাভাষ করিতেন। উলা ব্রাহ্মণ-কুলীন-মণ্ডলীর স্থান। কুলীনগণের কলঙ্ক চিরপ্রসিদ্ধ। কুলীন-কন্যাগণের কলঙ্ক-কথায় কটাক্ষ করিয়া রাজা মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেন, "মুখুয্যে, তোমাদের উলায় নাকি বৌ বিক্রী হয়?" মুখুয্যে অমনই ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ, যখনই নিয়ে যাবেন!"

বাইজির সাম্‌নে গিয়া, তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিবে,—

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারই।

শ্যামাপূজার রাত্রিতে হোরির গান গাহবে,—

শ্যাম মতে মার পিচিকারী হো,
ভিঙ্গ গেই মেরি নীল সারী হো।

আর ঝুলনের রাত্রিতে গাহিবে,—

নীলবরণী নবীনা রমণী,
নাগিনী জড়িত জটাবিভূষণী।

বদ্‌রসিকের কাছে সুরের তাল নাই, লয় নাই; রাগের কাল নাই, অকাল নাই। এই সকল মহাপ্রভুদের গুণেই চৌতালে মালকোষের টপ্পা নাই এবং ঠুংরিতে কালাংড়ার ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়।

বদ্‌রসিকের গন্ধ-জ্ঞানও চমৎকার! টাকায় চৌষট্টি পয়সা, সুতরাং টাকার জিনিষ সুগন্ধ, আর পয়সার জিনিষ দুর্গন্ধ বলিয়া বদ্‌রসিকের ধারণা আছে। আমাদের বোধ হয়, বদ্‌রসিকের বিস্তার হওয়াতেই বড়-বাজারে বাদামে বরফি বিক্রয় হইয়া থাকে। ওরূপ দুর্গন্ধ দ্রব্য বোধহয় দুনিয়ায় আর নাই। বাদামে বরফি বড় মানুষের বৈঠকখানায় রূপার সাল্-

বোটের উপর হইতে স্বচ্ছন্দে বুক ফুলাইয়া বলিতে পারে,—

কি ছার পোকার গন্ধ ছারপোকা গায়ে ?

অথচ সকল দিকেই রসজ্ঞতার অভাবে এইরূপ কদর্য্য পদার্থের ক্রমেই প্রাদুর্ভাব হইতেছে। স্বতন্ত্র জাফরাণের জ্বালায় কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া মুখে আনা যায় না, পোলাওয়ে ম্যাজেণ্টা দেখিলে গা ঘিন্ ঘিন্ করে, আর খাদ্যদ্রব্য মধ্যে গন্ধদ্রব্য কস্তুরির বিস্তার দেখিয়া হতাশ হইতে হয়।

যখন তুমি দারুণ যম-যন্ত্রণায় কাতর, পরমাত্মীয়ের বিয়োগে ব্যাকুল—বেতালা তালকাণা সেই সময়ে আসিয়া তোমার কাছে তাহার পুত্রের অন্নপ্রাশনের আড়ম্বর বৃদ্ধি করিবার অভিলাষে ঋণ যাচ্ঞা করিবে ; আর তুমি যদি তোমার পিতৃশ্রাদ্ধের সময় তাহার সামিয়ানাটী আনিয়া থাক, তবে সে আঁশপান্নার দিন রাত্রি দুপুরের সময় তোমার উঠান হইতে সেইটী খুলিয়া লইতে আসিবে।

ইহাদের সহিত পথ চলা, গাড়ি চড়া, নৌকা ভাসান বড়ই বিড়ম্বনা। পথ চলিতে হইলে দশ পা গিয়াই পথ হাঁটার কষ্ট ব্যাখ্যা করিতে থাকিবে—ধূলা বড়, আবুড় খাবুড়, টক্কর লাগে—রোডশেসের টাকাগুলা যায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সম্বন্ধীর উদরে—রাস্তার ধারে ভাগাড় কেন ?

এইরূপ ঘেন ঘেনানি সমস্ত পথটা। শস্য-শ্যামলক্ষেত্রের উপর পবন-গমনে যে সবুজ সাগরের ঢেউ খেলাইতেছে, চক্ষু বুলাইয়া তাহা কখন দেখিবে না, দেখাইলেও বুঝিবে না; পথের পাশে কুলগাছের উপর আল্‌গোছ লতা সোনার ছাতার মত রহিয়াছে, সেওড়া গাছটিকে লতাপাতায় ঘেরিয়া সবুজ ফোয়ারার মত করিয়া তুলিয়াছে, উহার উপরে ছ-পাপড়ি শাদাফুলগুলি পুট পুট করিয়া ফুটিয়া রহিয়াছে, কুল কুল করিয়া মাঠের জল আসিয়া খালে পড়িতেছে, তালপুকুরের ঘাটে বসিয়া পল্লীগ্রামের রূপসীরা একই কালে অঙ্গ-সংস্কার, দরিদ্রের শ্রাদ্ধ এবং অশ্লীলতা নিবারণী সভার সিদ্ধান্ত নিঃশেষ করিতেছে,—যে কেবল পথের কষ্ট ভাবে, সে কি এ সকল ভালমন্দ কিছু দেখিতে পায়?

নৌকাতে ইহাদের কষ্ট ততোধিক; আর সঙ্গীদের ত কষ্টের সীমা নাই। শুশুক ভাসিলেই হাঙ্গর, মেঘ ডাকিলেই সাইক্লোন, আর নৌকা নড়িলেই মহাপ্রলয়। কাহাকেও একটু থুথু ফেলিবার জন্য নড়িতে দিবে না,—নৌকা বান্‌চাল হইবে, নৌকা বসিয়া যাইবে।

রসহীন ব্যক্তিগণের সকল কার্য্যেই এইরূপ। যাহার রসবোধ নাই, তাহার সাহস নাই, স্থৈর্য্য নাই, প্রফুল্লতা নাই,—কিছুই নাই। ইহাদের সহিত বাস করা অপেক্ষা

বিরাগী হইয়া বনে যাওয়া ভাল; ইহাদের সহিত পথ চলা অপেক্ষা আলিপুর জেলের কয়েদী হওয়া ভাল।

গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং—আবার রসিকতা-ব্যবসায়ী বদ্‌রসিক আছেন; ইঁহারা কখন কথক, কখন লেখক, আর কখন বা সমালোচক।

ইঁহাদের কথার নমুনা কতক কতক দেওয়া গিয়াছে; তুলনা ইঁহাদের অদ্ভুত। কবে তাঁহার পিত্তজ্বর হইয়াছিল, একবাটী পিত্ত বমন করিয়াছিলেন, তাই যেখানে যখন ভোজের নিমন্ত্রণে যাইবেন, সেই খানেই সেই পিত্তের সহিত তুলনা করিয়া মাছের ঝোলের ব্যাখ্যান করিবেন। আর 'শীতল যেমন আগুন', 'মিষ্ট যেমন নিম-বেগুণ'—এ সকল বাঁধি বদ্‌রসিকতা ত চিরদিনই সমান কপ্‌চান' আছে।

রসবোধরহিত গুণধামগণ যখন লিখিতে বসেন, তখন খোঁজেন কেবল নূতন পন্থা। সকলেই কামিনীদিগের কোকিল-কণ্ঠের সুখ্যাতি করিয়াছেন, ইনি কাজেই প্রেয়সীর পাপীয়া-কণ্ঠ বড়ই পিয়ার করেন। কমলাকান্ত বলিয়াছেন, —মনুষ্য গাছের ফলের মত নানারূপ হইয়া থাকে; এই সকল লেখকেরা উদ্ভাবনী শক্তিদ্বারা নূতন কথার আবিষ্কার করিয়া আস্ফালন করেন, বলেন,—মনুষ্য গাছের পাতার

মত, তাহাতে শির আছে, ডাঁটা আছে, কখন হল্‌দে, কখন কাল, কখন শাদা। 'জোনাকি-ধ্বজ' এবং 'অচের সৈন্য' ইঁহাদেরই ভাষা; আর মনুসংহিতা দগ্ধ করিয়া সেই ভস্মে আপন গালে চূণকালি মাখা ইঁহাদের রসিক ভাবের জ্বলন্ত পরিচয়।

সমালোচক ভাবেই বদ্‌রসিকের পূর্ণাবতার। এই বেশে তাঁহাদের বদ্‌সুর, বেতাল, ভগ্নকণ্ঠ, বিকৃত মুখভঙ্গি,—সকলই পূর্ণমাত্রায় সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। 'ঘৃণা! ঘৃণা!' বলিয়া এই শ্রেণীর সমালোচকগণ আপনাদের রসজ্ঞতার পরিচয় দেন। লেখক যাহা বলেন নাই, ভাবেন নাই, সমালোচক তাহাতে তাহা আরোপ করেন, তাহার পর পেশাদারি রসিকতার সুরে লেখেন,—"এ হেন লেখক যখন এ হেন কথা বলিতে পারেন, তখন এ ঘৃণা কোথায় রাখিব?" সুরসিকের উত্তর দিবার ইচ্ছা থাকিলে অবশ্য বলিতে পারেন, "সকলে যখন এ ঘৃণা তোমাতেই ন্যস্ত করিয়াছে, তখন তুমি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া এখানে সেখানে রাখিয়া গচ্ছিত ধন নষ্ট করিবে কেন? ঘৃণা যেখানে দশজনে রাখিয়াছে, সেই খানেই থাকুক।" ইঁহাদের মুখে যেমন 'ঘৃণা! ঘৃণা!' পেটেও তেমনই ঈর্ষা ও হিংসা। এঁরাই এখনকার দিনে মজ্‌লিসি লোক হইয়াছেন। প্রথমেই বলিয়াছি, এখন এই

সকল বগ্‌টেপা, হিংসে-ভরা, কোটর-চক্ষু, বিষদিগ্ধ লোকের ক্রমেই প্রাদুর্ভাব হইতেছে। ইঁহারা সকল কথাতেই একটু ঘৃণা-মিশ্রিত দম্ভের হাসি হাসিয়া বলেন, "হ'ল কি?"—আমরা বলি হ'বে আর কি?—অরসিকে রহস্য নিবেদনম্!

পূজার গল্প

(১)

বিজয়কৃষ্ণের বয়স বাইশ বৎসর; বাড়ী বীরভূমির গোপালপুরে;—রূপবান্, গুণবান্, বিদ্বান্। ছয় মাসের উৰ্দ্ধ হইল, এক সপ্তাহের মধ্যেই পিতা-মাতা উভয়েরই বিয়োগ হইয়াছে। শরতের শশধরের উপর পাতলা মেঘের আবরণের মত বিজয়ের মুখের উপর একখানি ছায়া আছে; ডান চক্ষুর ডান কোনে, বাম চক্ষুর বাম কোনে একটু যেন জলভরা জলভরা; নাসিকার দুই দিকে দুই চোখের দুই কোনে একটু যেন কালিভরা কালিভরা।

রথের পূর্ব্বে বাড়ী আসিয়াছেন। মনে করিয়া ছিলেন, পিতৃকৃত্যে বেশী খরচপত্র হইয়াছে, তাহাতে কালাশৌচ, এবার দুর্গোৎসব করিবেন না। সে কথা রহিল না। অনাহূত গ্রাম্য সমিতির সকলেই বলিল, 'মহামায়াকে আনিতেই হইবে। তবে সংকল্প রত্নমালার নামে করিলেই চলিবে।'

রত্নমালা বিজয়কৃষ্ণের ভগিনী, বাসর-বিধবা; বয়স বিংশতি বৎসর। বিজয়কৃষ্ণের বৃহৎ পরিবার; কুটুম্ব-

কুটুম্বিনীতে, দাসদাসী-কৃষাণ-কুপোষ্যে দুই বেলায় পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশত পাতা পড়ে। রত্নমালা মাতা দুর্গমণি জীবিত থাকিতেই এই বৃহৎ পরিবারের সহকর্ত্রী ছিলেন; এখন এককর্ত্রী। বেঁটেখেটে, কর্ম্মিষ্ঠা, মুখরা, পবিত্রা।

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন, "রত্নমালা এবার তোমার নামে সংকল্প হইবে।"

রত্নমালা। কিসের সংকল্প দাদা?

বিজয়। দুর্গোৎসবের সংকল্প। আমাদের যে কাল-শৌচ।

রত্ন। দাদা, আমার ত সংকল্পও নাই, বিকল্পও নাই; —আমার যে মহা-অশৌচ। আমি যে উচ্ছব নিয়ে আছি, তাই ভাল, আমার আবার দুর্গোৎসব কেন?

বিজয়। কেন, তোমার পূজা হইলে ক্ষতি কি?

রত্ন। ক্ষতি নাই? মহা ক্ষতি। আমার ঠাকুর আমি বরণ করিব না, বরণডালা ছোঁব না,—অমন অর্দ্ধেক পূজা আমি করি না। মহিষের উপর আমার মত ঠেটীপরা ঠাকুর আনিতে পার—আমার নামে সংকল্প হইবে।

বিজয়। তোমার সকল কথা সকল সময়ে বুঝিতে পারি না বোন্।

রত্ন। তবে তুমি কি লেখাপড়া শিখিলে দাদা?

আবার এখন ধর্ম্ম-কথা কও। আপনার মায়ের পেটের বহিনের মর্ম্ম কথাই বুঝিলে না, তবে আবার কি রকম ধর্ম্ম-কথা কও?

বিজয়। আমি অত ভাবি নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমার নামে সংকল্প হইবে, তোমার আহ্লাদ হইবে।

রত্ন। তা, তোমার আর মুখ ফিরাইয়া কাজ কি? তুমি যা মনে করিয়াছ, তাই হইবে। আমার এখনই আহ্লাদ হইতেছে। আমার নামেই সংকল্প হইবে; তবে রামজীবনপুরের আশ্বিনের কিস্তির টাকাটা আমায় রাখিতে হইবে; আমি অষ্টমীর ভোগে দিব।

বিজয় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "তাহাই হইবে।"

রামজীবনপুর রত্নমালার স্বামিত্যক্ত সম্পত্তি। তিনমাস অন্তর ইজারদার নব্বই টাকা করিয়া আনিয়া রত্নমালাকে দিত। রত্নমালা রসীদ দিয়া টাকাগুলি গণিয়া সিন্দুকে তুলিতেন। ইজারদারকে আহারাদি করাইয়া তাহারই হস্তে প্রতিবার আশি পঁচাশি টাকা আপন শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করিতেন। বলিয়া দিতেন, বড় গিন্নীর এই, মেজো গিন্নীর এই, আমার দেখনহাসির এই, (রত্নমালা নিজে সেজবৌ,

আর ছোটবৌ তাঁহার দেখনহাসি), আমার গাঁট-ছড়ার এই ; আর এই চারি টাকা—এইখান হইতেই সন্দেশ লইয়া যাইবে। গোপালপুরের আধাছানার সন্দেশ সে অঞ্চলে বড় প্রসিদ্ধ।

সদ্যো-বিধবা রত্নমালা বিবাহের পরদিন শ্বশুরালয়ে ক্রন্দনের রোলের মধ্যে নীতা হইয়া বিধবা ননদের অঞ্চলের সহিত আপনার অঞ্চলের গ্রন্থি দিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "এই তোমায় আমায় গাঁটছড়ার বন্ধন হইল।" সেই অবধি তিনি তাঁহাকে 'আমার গাঁটছড়া'—বলেন।

(২)

আজ মহাষ্টমী। গোপালপুরের বাঁড়ুয্যেদের পূজার মত পূজা। সপ্তমীর ভোজের ভাঁড়ে ও শালপাতে দিঘীর পাড় পর্ব্বতাকার হইয়াছে। কাকগুলা এঁটোপাতের ভাত খাইতেছে কি ছড়াইতেছে, তাহা বুঝা যায় না। কুকুরগুলা কলহ কোলাহল করিতে করিতে কাকেদের উপর গিয়া পড়িতেছে ; তাহার দুই চারিটা লাফাইয়া লাফাইয়া সরিয়া যাইতেছে ; দুই চারিটা বা একখানা পাখা তুলিয়া, একটু উচু হইয়া, একটু উড়িয়া বসিতেছে।

রত্নমালা অতি প্রত্যূষে স্নানাহ্নিক করিয়াছেন। পরিধানে হুবরাজপুরের মট্‌কা,—ঘাড়ে বেড় দিয়া কোমরে গোঁজা ;

লম্বিত কেশের নীচে একটা গ্রন্থি আছে। কতকগুলি কেশ কাণের উপর ফুলে ফুলে, কাণ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। রত্নমালা আজি সর্ব্বত্র। যেখানে নৈবেদ্য হইতেছে, সেখানে প্রতি নৈবেদ্যের থুরী মিলাইয়া দেখিতেছেন। গঙ্গাজলের ভার আসিল নিজেই নামাইয়া লইলেন; ঠাকুর ঘরে রাখিয়া আসিলেন। গোয়ালবাড়ীর ছাই-গাদার পার্শ্বে মাছ কোটা হইতেছে। তিনি গুল্কীকে বলিলেন, "ঐ ঝুড়িটা তোল্;" তাহার ভিতর হইতে একরাশি কোটামাছ বাহির হইল। গুল্কীকে বলিলেন, "ঐ ছাইগাদায় কি?" গুল্কী ছাইগুলা সরাইল। দুইটা রুয়ের মুড়া বাহির হইল। রত্নমালা যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন, "তোরা ত তেরজনেই চোর হইলি।"

ওদিকে অষ্টকুমারীর সাজসজ্জা হইতেছে। আটজন সধবা নাপিতানী আটজন কুমারীকে আল্তা পরাইয়া দিয়াছে। এখন আটজন সধবা কুটুম্বিনী তাহাদিগের কেশ বিন্যাস করিয়া দিল। গন্ধতৈলের গন্ধে সে স্থল আমোদিত। রত্নমালা সেইখানে যাইবামাত্র, তাহারা ঢুপ্ ঢাপ্ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রত্নমালা এদিকে বড় মুখরা, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিতে পারিতেন না।

(৩)

পূর্ব্ব হইতেই সকলে শুনিয়াছিল যে, রত্নমালা অষ্টকুমারী-পূজা করিবেন না। তিনি নাকি তাঁহার গাঁটছড়ার কাছে বলিয়াছিলেন, "এ জন্মে এই জন্ম-কুমারী, আমি আবার কুমারী পূজা করিব ?"

যাহাই হৌক কথাটা বিজয়কৃষ্ণের কাণে গিয়াছিল। যখন রন্ধনশালার দাওয়ায় রত্নমালা ভোগ-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত তখন তাঁহার দেখা পাইয়া বিজয় বলিলেন, "রত্নমালা! তুমি নাকি অষ্টকুমারীর পূজা করিবে না ?"

রত্ন। দাদা, আমারই কে পূজা করে, তাহারই স্থির নাই, আমি আবার আটটা ছুঁড়ীর পা পূজা করিতে যাইব ?

বিজয়। আমাদের পুরুষ পুরুষের প্রথা আজি তুমি মানিবে না ?

রত্ন। তোমাদের প্রথা তোমরা মানিও। এবার ত তোমার গোপালপুরের বাঁড়ুযোদের পূজা নয়। আমাদের হরিপুরের পূজা, আমরা গঙ্গাজলই বুঝি।

হরিপুরে রত্নমালার শ্বশুরগোষ্ঠীর মধ্যে যে বাড়ীতে পূজা হইত, তাহারা বড় কৃপণ ; সে পূজা সত্য সত্যই, গঙ্গাজল বিল্বদলের বটে।

বিজয়কৃষ্ণ একটু হাসিয়া বলিলেন, তা সে কথা এখন থাকুক, তোমার পূজা যে অঙ্গহীন হইবে তাহার কি ?

রত্ন। তা হয় হবে, আমারই হবে; অধর্ম্ম হয়, আমারই হবে। ছুঁড়ীকয়টা বাড়ীতে আসিয়াই আমার পায়ে হাত দিয়া একবার প্রণাম করিয়াছে, আলতা পরিয়া একবার করিয়াছে, চুল বাঁধবার পর, এইমাত্র প্রণাম করিল। আমি ওগুলাকে পূজা করিতে, প্রণাম করিতে পারিব না। বিজয় অস্ফুটস্বরে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "এতদূর হইতে মেয়েগুলাকে আনান গেল, এখন কি করা যায় ?"

প্রৌঢ়া ঠাকুরাণীদিদি পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন; বলিলেন, "তা রত্ন মন্দ কি বলিতেছে ? সমানে সমানে নমস্কার হয় ত পাল্‌টাপাল্‌টি চলে; পায়ে ধরিয়া প্রণাম করার পাল্‌টাপাল্‌টি চলে না ভাই।"

বিজয় রত্নমালার দিকে পিছন করিয়া, অল্প মৃদুস্বরে উত্তরচ্ছলে বলিলেন, "তা ঠান্‌দিদি, তোমরা যার পা পূজা কর, তাকেই আবার পায়ে ধরাও; মনে করিলে, তোমরা সকলই পার।" ঠাকুরাণীদিদি একটু হাসিলেন মাত্র। ঠাকুরদাদার বড় স্ত্রৈণ বলিয়া সুখ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল।

রত্ন। তা ঠান্‌দিদির হয়ে আমিই বলি, তোমরাও

একজনের পা পূজা করিয়া, আবার তাকেই পায়ে ধারা'; ওটা কেবল আমাদের এক-চোট নয়।

বিজয়। তোমাকে ঠান্‌দি'দির হয়ে উত্তর করিতে কে সাধিল?—কৈ ঠানদিদি! আমরা কখন পূজনীয়ার পূজা লই কি?

রত্ন। লও বই কি! এই দুই বৎসর না যাইতে তুমিই লইবে।

বিজয়। তাকি কখন হয়?

রত্ন। নিচেই হবে। ঠানদিদি তুমি সাক্ষী রহিলে।

ঠাকুরাণীদিদি ব'ললেন, "এমন ভাইবোন্ কি কেউ কোথাও দেখিয়াছে? পিটেপিটে কিনা, এখনও সেই ছেলে বেলার মত তেমনই ঝগড়া।"

(৪)

পূর্ব্বতন প্রথা অনুসারে গোপালপুরের বাঁড়ুয্যেবাড়ী অষ্টমীতে অষ্টকুমারীর পূজা হয়। প্রত্যেককে মটরাচেলী সোঁসাজ সিন্দুর-চুপড়ি ও সোণার কঙ্কণ দিতে হয়।

সে বার কুমারীর পূজা হইল না, তবে যথারীতি অলঙ্কার-বস্ত্রাদি দেওয়া হইল।

ছয়টী কুমারী গ্রামেরই; দুইটীকে দূরবর্ত্তী ভিন্ন গ্রাম হইতে অনেক যত্ন করিয়া রত্নমালা আনাইয়াছিলেন।

গ্রামের কুমারীগুলি বস্ত্রাদি লইয়া আহার করিয়া আপন আপন বাড়ীতে চলিয়া গেল; অপর দুইটী পূজার কয়দিনের জন্য রহিল।

একটীর বয়স দশ, একটীর একাদশ। ছোটটীর সিঁথে সাজন্ত চুল, কপালে জোড়াভুরু; কিন্তু চক্ষু চঞ্চল, দাঁত-গুলি ছোট ছোট, ঠোঁট পাতলা পাতলা—কিন্তু কথায় খুব ঠক্‌ঠকে। কল কল হাসে, থর্‌থর্ হাঁটে; হাত নাড়িয়া কথা কয়, আর চারিদিকে চাহিতে থাকে। তাহার নাম বিজলী।

বড়টীর ঘাড়টী একটু বাঁকান, একটু নোয়ান। চোখ দুটি ভাসা ভাসা, দৃষ্টি স্থির; গতি ধীর; অল্প পুরু পুরু ঠোঁটে পাতলা পাতলা হাসি মাখান; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত;—সে হাসি উঠেও না, গড়ায়ও না,—ঐ মাখানই থাকে। নাম কোমলা।

বিজলী কোমলা আর পাঁচজন কুটুম্ব-কন্যার সঙ্গে বড় ঘরে পানের সজ্জায় রহিল।

ধূনা পোড়ানর বাজনা উঠিল। কুণ্ডলীকৃত-মার্জ্জনী-মস্তকে আসীনা সধবা বিধবায় পূজার উঠান পরিপূর্ণ হইল। জুম্বো জুম্বো, কালো কলো ব্রাহ্মণ-যুবকেরা সারির মধ্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল;

নারীগণের হস্তে মৃত্তিকার তাল দিতেছে; হাতে মাথায় মাল্সী বনাইতেছে; জ্বলন্ত কুলের কাষ্ঠ দিতেছে, ধূনা দিতেছে। দশ বিশটা মাল্সী একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপের চণ্ডীমূর্ত্তি যেন একরূপ জ্বলন্ত হাসি হাসিতে লাগিলেন। সকলেই ধূনা পোড়াইল। রত্নমালা সে দিকেই আসিলেন না। তখন অন্তর বাড়ীতে কেহ নাই বলিলেই চলে, কেবল রত্নমালা বিজলীকে আর কোমলাকে বাহিরে যাইতে দেন নাই। বিজলী বলিল, "কেন দিদি এখন বাহিরে যাইব না?" রত্নমালা বলিলেন, "এখন ওখানে গেলে পুড়িয়া যাইবি যে ছুঁড়ি!" উত্তর—"তোমাদের বাড়ী এমন?" কোমলা শুধুই হাসিল।

ব্রাহ্মণ-ভোজন শেষ হয় হয়, এমন সময় বিজয় রত্নমালার কাছে দক্ষিণা ও পান লইতে আসিলেন। রত্ন অঞ্চল হইতে দক্ষিণার টাকা দিলেন, আর বলিলেন, "চল, ঐ বড় ঘরের পিঁড়িতে চল।" সেইখানে আসিয়া বলিলেন, "দে লো দাদাকে পান বাহির করিয়া দে।" বিজলী তাড়াতাড়ি কতকগুলো পান আনিয়া "এই নেও" বলিয়া বিজয়ের হস্তে দিতে লাগিল। বিজয় বলিলেন, "এই মেয়েটী বেশ চট্পটে।" কোমলা থালে করিয়া কতকগুলি পান আনিয়া বিজয়ের সম্মুখে ধীরে রাখিয়া দিল। বিজয়

কোমলার দিকে একবার দেখিয়া আবার বিজলীর দিকে চাহিলেন। বিজলী বলিল, "আরও পান দিব?" বিজয় "এখন আর না" বলিয়া চলিয়া গেলেন। রত্নমালা বলিল, "বুঝেছি, ইহার পর চাই। যেটুকু বুঝিতে বাকি রহিল আর বৎসর বুঝিব।"

(৫)

সেই আর বৎসর আসিল। বিজয়কৃষ্ণের সংকল্পের প্রথম পূজা। তেমনই মহাষ্টমীর সুপ্রভাত; তেমনই করিয়া সুলালসিং দেউড়ির খাটিয়ায় সঙ্গের শিবের মত কাত হইয়া ঝিমাইতেছে। তেমনই করিয়া সোণাসিং, রূপসিং রোয়াকে পাচারি করিতেছে। তেমনই করিয়া রত্নমালা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। কথাই ছিল কুমারীরা আর বৎসর বিনা অর্চ্চনায় গিয়াছিল, এবার তাহারাই আসিবে। গ্রামের—ভিন্ন গ্রামের সকলেই আসিয়াছে। বিজলী ও কোমলা তেমনই বড় ঘরে পানের সজ্জায় আছে। বিজলীর দশে একাদশ উত্তীর্ণ হইয়াছে; বিশেষ বিভেদ লক্ষিত হইতেছে না। সেই ঢলঢল লোচন, কলকল হাস, থরথর গতি, আর ঠক্‌ঠকে কথাবার্ত্তা। কিন্তু কোমলার এই এক বৎসরে বড়ই বিভেদ হইয়াছে। সমস্ত শরীরের উপর তারুণ্যের একটী লাবণ্যময়ী ছায়া পড়িয়াছে। ঘোলাটে

ঘোলাটে জ্যোৎস্নায়, সন্ধ্যার সময় ভূরি-কুসুমিতা যূথিকা-লতা যেমন দেখায়, তেমনই দেখাইতেছে।

অষ্টকুমারীর অর্চনা হইতে লাগিল। কুমারীগুলি একদিকে সারি দিয়া আপন আপন আসনে বসিল। সম্মুখে সুপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ। পরিধান রক্তপট্টবস্ত্র। রক্তপট্টবস্ত্রের উত্তরী যোগ-পাটার মত করিয়া বুকে বাঁধা। বিজয়কৃষ্ণ একবার কুমারীগুলিকে দেখিতে লাগিলেন। ছোট একটী ছয় বৎসরের মেয়ে,—সেও এমন সময় আপনার গুরুত্ব বুঝিয়াছে,—গম্ভীর মুখে স্থিরদৃষ্টিতে বসিয়া আছে। আর একটী তাহার চেয়ে একটু বড়; তাহার ঝাপ্টা দুটীতে একটু ডাগর ডাগর ফাঁস দেওয়া। সে নত হইয়া বসিয়া আছে,—সেই ফাঁসগুলি দুলদুল দুলিতেছে। সেও গম্ভীর। তাহার অপেক্ষা একটী বড় মেয়ের কাণ দুটী করবীর পুষ্পের মত, তাহাতে সবুজ দুল। সে টিপিটিপি হাসিতেছে। বিজলী গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিল, কিন্তু চক্ষু একবার পুরোহিতের দিকে, একবার প্রতিমার দিকে, একবার সম্মুখস্থ সিঁদুর চুপড়ির দিকে; বিজয়ের চক্ষুর দিকে চক্ষু পড়িতেই হাসিয়া ফেলিল। ঘাড় ফিরাইয়া কোমলাকে অস্ফুটস্বরে বলিল, "হাতীতে কলাগাছ খাইতে ভালবাসে, তাই গণেশ কলাবৌকে বিয়ে করিয়াছে; নয় ভাই?" কোমলা

ভ্রূকুটি করিয়া অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "মেয়েদের খাবার জন্য পুরুষেরা বিবাহ করে বুঝি?" বিজলী বলিল, "তা নয় ত কি জন্য করে?"

বিজয়কৃষ্ণ এতক্ষণ দশভুজার মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; তাহার পর বিজলীর মুখের দিকে দৃষ্টি করিলেন। বিজলী সে দৃষ্টি সহিল না—মুখ ফিরাইয়া পুনরুক্তি করিয়া কোমলাকে মৃদুস্বরে বলিল, "খাবার জন্যই ত বিবাহ করে।"

বিজয় একে একে কুমারীগুলির পাদপূজা করিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিলেন। পরে একে একে ছয়টী বালিকার দক্ষিণ হস্তে কঙ্কণ পরাইয়া দিলেন। বিজলী বাম হস্ত বাড়াইয়া দিল; বিজয় কঙ্কণ-গাছটা সেই হস্তেই পরাইলেন। সকলে বলিল, "ও কি হইল? বাম হাতে পরাইলে কেন?" বিজয় তখন কঙ্কণ খুলিতে গেলেন। তাহারাই আবার নিষেধ করিল,—বলিল, "পরাইয়াছ আর খুলিও না।" কেহ কেহ বলিল, "তা এক হাতে হ'লেই হ'ল।" মুরুব্বিরা বলিল, "তাও কি কখন হয়? উঁদের কৌলিক প্রথা রাখিবেন না?" বিজয় যেন কত কুকর্ম্মই করিয়াছেন! একটু হতভম্ব হইয়া আর যে এক-গাছি কঙ্কণ ছিল তাহাই বিজলীর দক্ষিণ হস্তে পরাইয়া

দিলেন। বিজলী মনে মনে বলিল, 'বেশত—আমার দুহাতে দুগাছি হইল।"

কিন্তু কোমলার হাতে কি দেওয়া হইবে? ভিতর চণ্ডীমণ্ডপে রত্নমালা ছিলেন। বিজয় তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "যদি থাকে ত সিন্দুক হইতে একগাছি কঙ্কণ লইয়া এসো।" রত্নমালা চকিতের মধ্যে একগাছি বড় কঙ্কণ আনিয়া বিজয়ের হাতে দিয়া বলিল, "এই লও; এ মায়ের কঙ্কণ—বৌ এলে পরিবার কথা।" বিজয় বলিলেন, "মা কিছু বলিয়াছিলেন কি?" রত্ন বলিলেন, "না, তিনি আর বলিলেন কৈ? বাবার তেমন হওয়ার পর যে ছয় দিন বিছানায় ছিলেন, কোন কথাই ত কন নাই।" বলিতে বলিতে রত্নমালা চক্ষে অঞ্চল দিলেন। বিজয়ও বাষ্পাকুললোচনে কঙ্কণগাছটী নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন, "হোক, মায়ের কঙ্কণ আর কাহারও পরিয়া কাজ নাই, মাই পরুক।" বলিয়া কোমলার দক্ষিণ হস্তে সেই বৃহৎ কঙ্কণ পরাইয়া দিলেন; দিয়া একবার মহাশক্তির মুখের পানে চাহিলেন। বিজলী অমনই কোমলার কাণে কাণে বলিল "তোর ত বেশ ছেলে! যেন দুর্গার ছেলের মত, নয়?" কোমলা বলিল, "তা বেশই ত।" বিজয় কুমারীপূজা শেষ করিয়া সর্ব্বশেষে কোমলার পদতলের কাছে প্রণাম করিলেন।

রত্নমালা বাড়ীতে আসিয়া ঠাকুরাণীদিদিকে ডাকিয়া বলিল, "যেটুকু বাকি ছিল, বুঝিয়াছি। এখন দিদি তোমার আমার হাতযশ।"

(৬)

পূজার পর ত্রয়োদশীর দিন কুটুম্ব-কন্যারা একে একে বিদায় লইতে লাগিল। রত্নমালা খিড়কী-পথের উপর কাহাকেও গোরুর গাড়ীতে, কাহাকেও পাল্‌কীতে হাতে ধরিয়া তুলিয়া দিতে লাগিলেন। গাড়ীর মধ্যে পাল্‌কীর ভিতরে হাঁড়ী ভরিয়া সন্দেশ দিলেন। গাড়োয়ান বেহারাদের ভাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জলপান লাড়ু দিলেন। বিজয় একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। বিজলী তাঁহার দিকে গিয়া বলিল, "আমরা চলিলাম।" বিজয় বলিলেন, "এসো।" কোমলাও বিজলীর সঙ্গে গিয়াছিল, কিছুই বলিতে পারিল না; কেবল নখে নখ খুঁটিয়া চলিয়া আসিল। বিজয় রত্নমালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাকে খাবার দিয়াছ?" রত্নমালা বলিল, "দিয়াছি, সকলকেই দিয়াছি,—মাকে দিয়াছি, মার বৌকেও দিয়াছি।" বিজয় বলিলেন, "মায়ের আবার বৌ কোথা হ'তে হইল?" রত্নমালা বলিলেন,—"না বিয়েয়ে কানায়ের মা হইতে পারিল—আর বিজলীর ঠাকুরণ হ'তে পারিবে না? কাল যে, ওরা

দুজনে 'বৌঠাকুরণ' পাতাইয়াছে।—আমার দুখানা নূতন কস্তাপেড়ে স্যাড়ী গেছে, আর পাঁচসিকা গেছে; তোমায় কিন্তু দিতে হবে দাদা।"

বিজলী মাসীর সঙ্গে পাল্‌কীতে উঠিয়াছিল; বলিল, "তা তোমাদের কাপড় তোমরা লও। এই আমার খানি লও; ঠাকুরণ! তোর খানি দে ত লা।—আর পাঁচসিকা সন্দেশের দিয়েছিলে, তা সন্দেশ ত নাই, এই হাড়ীর সন্দেশ লও।" রত্নমালা বলিলেন, "আমি আমার দাদার কাছে দাম চাহিতেছি, তা তোমার এর মধ্যে এত মাথা-ব্যথা পড়িল কেন? এত ব্যথার ব্যথী এতদিন কোথায় ছিলি?" বিজলী বলিল, "ব্যথার জন্য নয়,—আমাদের জন্য ত এত খোঁটা! তা তোমাদের কাপড় লওনা কেন?" রত্নমালা বলিলেন, "ফাল্গুন মাসে এসো দিদি,—সব কাপড় চোপড় বুঝিয়া লইব।"

বিজলী। ফাল্গুন মাসে কি গা?

রত্নমালা। দাদার বিয়ে।

বিজলী। কোথায় বিয়া হইবে?

রত্নমালা। তোমাদেরই গ্রামে।

পাল্‌কী চলিয়াছে। বিজলী মাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাসী কোথায় বিবাহ হবে গা?" মাসী বলিল, "আমাদের

গ্রামে ওঁদের ঘর আর কৈ ? তোমার বাপেরাইত এঁদের পাল্‌টি ঘর। বিয়ে হয় ত, তোমার সঙ্গেই হইবে!" তখন বিজয় কর্ত্তৃক বাম হাতে কঙ্কণ পরান' হঠাৎ বিজলীর মনে পড়িল। সেই কঙ্কণের দিকে দেখিল ; মনে হইল, এখনই বুঝি বিজয় কঙ্কণ পরাইল। পার্শ্বে প্রতিমা আছে মনে করিয়া, সেই দিকে মুখ ফিরাইল। দেখিল, দূরে দিঘীর পাড়ে কলা-বাগানে হাতীতে কলাগাছ ভাঙ্গিতেছে। ইচ্ছা হইল, মাসীকে জিজ্ঞাসা করে যে, পুরুষে কি খাবার জন্য বিবাহ করে ? মুখ ফুটিফুটি করিয়া ফুটিল না। বুক হইতে মাথার দিকে কেমন একরূপ ঝাঁঝের মত ছুটিতে লাগিল। হাতী একটা আস্ত কলাগাছ শুঁড়ে জড়াইয়া লইয়া সেই দিকেই আসিতেছে। বিজলী একদৃষ্টে তাহাই দেখিতে লাগিল। হুম্মা হুম্মা করিতে করিতে পাল্‌কী দৌড়িতে লাগিল।

(৭)

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি। মনোরম প্রভাত। ঝিরি ঝিরি বায়ু বহিতেছে। ধীরি ধীরি গাছের নীচের পাতাগুলি দুলিতেছে। বিজয়কৃষ্ণের বাটীর সম্মুখস্থ বকুলগাছে দুইটা দৈয়াল অতি প্রত্যূষ হইতে তিন ঘণ্টা সমানে আখড়াই তান করতপ করিতেছে। তোমরা জান, কাহার জন্য

তাহারা এই গান করে? আর কে তাহাদের এই আখ্ড়া ঘরে তালিম দেয়?

বিজয়ের বহির্বাটীতে বৈঠকখানায় কেবল গোমস্তা আর একজন খানসামা অগাধ নিদ্রাভিভূত; ছেলে বুড়া আর কেহ নাই। দেউড়িতে চারিজন দরওয়ান শুইয়া আছে। বাহিরের বাড়ী যেন পালান' বাড়া। গাড়ু গুলা স্থানভ্রষ্ট, গামছাগুলা সিঁড়ির উপর; আর চূণে হলুদে সমস্তই বিকৃত। কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিজয়কৃষ্ণ দলবলে বিবাহ করিতে গিয়াছেন।

ঠাকুরাণীদিদি অর্দ্ধশয়না; তাঁহার পার্শ্বে মেঝেতে বসিয়া রত্নমালা চুল ফুলাইতেছেন। গোছাগোছা চুল খুলিয়া আসিতেছে, তাহাই বাম হাতে জড় করিতেছেন। সহসা রত্নমালা বলিলেন, "তা যাই হোক দিদি, আজি বেহারারা বাড়ীর মধ্যে পাল্‌কী লইয়া আসিলে, তুমি আমাকে ধরিয়া রাখিও—আমি সকলের সাক্ষাতে নাচিয়া না ফেলি।"

ঠাকুরাণী। তা আহ্লাদের দিনে নাচিলেই বা।

রত্ন। ছি! লজ্জা করে যে।

ঠাকুরাণী। লজ্জা করিলে আর নাচিতে পারিবে কেন?

রত্ন। যদি আহ্লাদে লজ্জা করিতে ভুলিয়া যাই?

ঠাকুরাণী। নাচিবে।

রত্ন। তা হবে না দিদি। তুমি আমার কোমর ধরিও।

ঠাকুরাণী। তার জন্য আর ভাবনা কেন ?

রত্ন। ঠাকুরাণীদিদি, মা মরে অবধি আমার আর কিছুতেই সোয়াস্তি নাই। কিসে দাদার মনের মত বৌ আনিয়া ঘরে তুলিব, আমার অষ্টপ্রহর সেই ভাবনাই ছিল। এ দুবৎসর আমার আর ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই নাই। একে নিকটে দাদাদের ঘর জুটে না, তারপর, কি পছন্দ কি অপছন্দ তা'ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই। বুঝিতে পারি না যে, একটু খরখর আনিব, না মাটো মাটো আনিব ? এইজন্য দুই রকমই জুটাইয়াছিলাম।

ঠাকুরাণীদিদি শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন; বলিলেন, "তোমাকে যখন অত ভালবাসে, তখন খর নহিলে ওর মন উঠিবে কেন বোন ?"

রত্ন হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল, "সে তামাসা এখন থাক্। আমি মায়ের পেটের বোন্—আমায় ত ভাল বাসিবেই। আমার সঙ্গে যেমন নিত্য বিবাদ, পরের মেয়ে ঘরে এনে, তেমনই নিত্য কলহ, দাদার ভাল লাগিবে কি ?"

ঠাকুরাণীদিদি এবার গা ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

মস্তকের উপর দেওয়ালে কাত্যায়নীর চিত্র ছিল। সেই দিকে হস্ত তুলিয়া বলিলেন, "জগদম্বা করুন, আমি এই প্রাতর্ব্বাক্যে বলিতেছি, তোমাদের ভাইবোনে যেমন বিবাদ তেমনই বিবাদ বিজয়-বিজলীতে যেন চিরদিনই থাকে।"

তখন দুই জনেই সজল চক্ষে স্নানার্থ গমন করিলেন। যাইবার সময় উত্তরদ্বারী ঘরের নিকট দাঁড়াইয়া রত্নমালা বলিলেন, "ওলো কোমলামাসী! ওঠ না। তুমি বৌ-বেটাকে বরণ করিবে, তোমার আর ঘুমান কেন?" কোমলা হাসিমাখান মুখে বাহিরে আসিল। কোমলার ললাটের সিন্দূর-বিন্দু বসন্তের শাল্মলীর মত রগ্‌রগ্‌ করিতেছে। কোমলার বিবাহ হইয়াছে। ছয়মাস পূর্ব্বে যাহা লাবণ্যের ছায়া দেখিয়াছিলাম, এখন সেই লাবণ্যই এক ফোঁটা সিন্দূরের গুণে জ্বলজ্বল্ করিতেছে।

(৮)

একটু বেলা হইলেই মহা কোলাহল হইতে লাগিল। চূর্ণ-হরিদ্রাক্ত বস্ত্রে বরযাত্র সকলে দলে দলে আসিয়া অঙ্গন পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। এখানেও কে কোথা হইতে গামলা গামলা চূণে হলুদ আনিয়া উপস্থিত। মোটা-মোটা বালা-হাতে বড়-বড় লাঠি-কাঁধে সর্দ্দার সকল আসিতে লাগিল। সকলেরই মুখে এক কথা, "খাইয়েছে খুব, মশা

বড়।" তাহার পর চারি দল রোশন-চৌকির বাদ্যধ্বনির সঙ্গে পঞ্চাশ জন বেহারার বিকট আওয়াজ। তাই শুনা যাইতেছে, আর কিছুই শুনা যায় না। দুইজন ঝি শুদ্ধ, আটজন বেহারার কাঁধে একখানা পাল্‌কী ভিতর বাড়ীতে উপস্থিত। জল ঢালিয়া পিছল করিয়াছে; চুণে হলুদে উঠান লাল করিয়াছে; তাহার উপর লাল কাপড় পাতিল। সেই কাপড়ের উপর পয়সা ছড়াইল, সিকি ছড়াইল,—টাকা ছড়াইল, তবে বেহারারা পাল্‌কী নামাইল। কোমলা কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া ঠাকুরবাড়ীতে প্রণাম করাইতে লইয়া গেলেন। সেখান হইতে প্রণাম করিয়া আসিয়া কন্যা বরকে প্রণাম করিবেন, এই প্রথা। বিজয় বড় ঘরের রোয়াকে পশ্চিমাস্যে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুরাণীদিদি কন্যাকে হাঁটাইয়া সঙ্গে করিয়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড় করাইলেন, গাঁট-ছড়ার একদিক্ কন্যার গলায় বেড় দিয়া ঝুলাইয়া দিলেন। অপর দিক্‌টা বিজয়কে ধরিতে বলিলেন। কন্যা ধীরে ধীরে বিজয়ের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। রত্নমালা বলিল, "কেমন দাদা! তোমরা যাকে প্রণাম কর, তাহার প্রণাম লও ত?" বিজয় ঘাড় নত করিয়া বলিলেন, "তোমার মনে এতটা ছিল, বুঝিতে পারি নাই।" ঠাকুরাণীদিদি বলিলেন, "আর আমার মনে কতটা আছে, তা

জান কি ? ইহার পাল্টা পায়ে ধরা যে দিন হবে, সেইদিন আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে !" সাক্ষী রমণীবৃন্দ ঝঙ্কারে হুলু দিয়া উঠিল। বাহিরে সানাই বাজিল—

"হাসি পায় হে,—ধরাদিন—পড়্‌লে মনে।"

মশক

আঃ রাম! বড় বিরক্তই করিল যে! এই ঘরের কোণের মশাগুলা, আর এই সংসারের কোণের মশাগুলা। আজি কোথা মনে করিলাম যে, একটু মাত্রা চড়াইয়া একবার freedom এবং free will (অদৃষ্ট ও পৌরুষের) তর্কটা মীমাংসা করিব, না কোথা হইতে দুই কাহণ ক্ষুদ্র পতঙ্গ আসিয়া শরীরের সমস্ত রক্ত শোষণ করিয়া ডবল মাত্রায় নেশাটা একেবারে নির্মাত্র করিল।

সংসারের ক্ষুদ্র মশকগুলা আরও বিরক্তকর। কোন একটা বিষয়-কার্য্যের একটু সূত্রপাত করিয়া কেহ বসিল যদি, অমনি জঙ্গল কর্দ্দম অন্ধকার হইতে পালে পালে পতঙ্গ উড্ডীন হইতে আরম্ভ হইল। মৃদু গুণ্ গুণ্ মৃদু গুণ্ গুণ্, ক্রমে দংশন ও শোণিত-শোষণ।

পুঁথিতে পড়িলাম যে, অতি অপরিষ্কার জল হইতে মশার উৎপত্তি হয়। বারাণসীস্থ জ্ঞানবাপীর অপূর্ব্ব পয়োরাশির আস্বাদ ও আঘ্রাণের কথা তখন আমার স্মরণ হইল। হিন্দুধর্ম্মের কল্যাণে ও আমার পূর্ব্বজন্মের পুণ্য-ফলে, সেই উদক এক গণ্ডূষ আমি উদরস্থ করিয়াছিলাম,

তাহা আমার স্মরণ হইল। মনে হইল, সেই জ্ঞানবাপীর এক গণ্ডূষ জল আনিয়া এই জীবতত্ত্বের রহস্য পরীক্ষা করিব। কিন্তু জ্ঞানবাপী কাশীধামে, আর আমি অজ্ঞান পাপী নদীধামে। সুতরাং সে জল আমার অতীব দুষ্প্রাপ্য। তখন মনে হইল, যে, বোধ হয় কালাপাহাড়ের ভয়ে বিশ্বেশ্বর সেই পথে পলায়ন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার জল ঐরূপ সমল ও দুর্গন্ধ হইয়াছে। মানবই হউন আর দেবতাই হউন, পলায়নের পথে সৌরভ ছুটিবে কেন? সেই পথ অবশ্য আলোকহীন হইবে, তাহার বায়ু দূষিত হইবে, গন্ধ দুর্গন্ধ হইবে ও জল পঙ্কিল হইবে। তবে আমার স্বদেশে এমন জল বিস্তর পাইব; যে পথে নবদ্বীপ হইতে লাক্ষ্মণেয় পলায়ন করেন, তাহাই আমার বঙ্গের জ্ঞানবাপী; সেই জল হইতেই আমার জীবতত্ত্বের পরীক্ষা হইবে। কিন্তু তাহার ত চিহ্ন দেখি না। সেই পথ থাকিলে আমি সেখানে একটী মেলা বসাইতাম। নব্যবঙ্গ-সন্তানকে একবার সেই ধুলা মাথাইয়া দিয়া বলিতাম, "যাও বাছা, শ্রীক্ষেত্রে যাও; যে পথে তোমার ধার্ম্মিক রাজা গমন করিয়াছেন, সেই পথে যাও।" তা—তাহারও কোন চিহ্ন নাই! বিশ্বেশ্বরের পথের জল আনিতে আমি যাইতে পারিলাম না, বঙ্গেশ্বরের পথের সন্ধান নাই। তবে

এখন প্রসন্নর গোশালায় আশ্রয় লইতে হইল। স্বয়ং কমলাকান্ত অনেকবার সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছেন। সেই জলেও কার্য্য হইতে পারে। অমনি আমার চিরেতার শিশিটী ধুইয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম। প্রসন্ন আসিলে বলিলাম, "প্রসন্ন! সেদিন তোমার সেই পাড়া-বেড়ানর পঞ্চরসের সেই যে এক গণ্ডূষ দিয়াছিলে, মনে আছে ত?" প্রসন্ন যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ঠাকুর মহাশয়, আমি ত আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আমার সে দুধ আপনাদের ঠাকুর দেবতার জন্যে নহে। আপনার কি মনে হইল, কিছুতেই ছাড়িলেন না, তাহাতেই সে দুধ আপনাকে একটু দিয়াছিলাম।" প্রসন্নকে অপ্রতিভ হইতে দেখিয়া আমি বলিলাম, "আমি সেজন্য তোমাকে অনুযোগ করিতেছি না; তুমি যে জল দিয়া সেই পঞ্চরস প্রস্তুত কর তাহা আমাকে এই শিশিটীর এক শিশি দিতে হইবে।" প্রসন্ন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ঠাকুর মহাশয়, আমরা কি দুধে জল দি?" আমি বলিলাম, "তা যাই হোক সেই জল একটু দিতে হইবে।" আমি শুনিয়াছিলাম (বোধ হয় দেখিয়াও থাকিব) প্রসন্নর গোশালার নিভৃত কোণে মৃৎপাত্রে জল থাকিত, যাহারা দূর জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে দুধে বড়ি খাওয়াইবার জন্য সুলভ মূল্যে নির্জ্জল দুধ লইত, প্রসন্ন তাহাদিগকে সেই গোশালার

বাহিরে দাঁড় করাইয়া গাভী দোহন করিত। গোশালায় কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিত না; তাহা হইলে কাঁচা গাই চমকিয়া উঠে। যাহা হউক প্রসন্ন আমাকে সেই অমৃত-কুণ্ডের জল প্রদান করিয়াছিল। শিশিটী আমি যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলাম।

সূত্রবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট তাহার মধ্যে অনবরত উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া খেলা করিতে লাগিল। তল হইতে উর্দ্ধে উঠিতেছে, উর্দ্ধ হইতে তলে নামিতেছে; উঠিবার সময় যেমন ক্রীড়া, নামিবার সময় তেমনই ক্রীড়া। ক্ষুদ্র জীবের উত্থান-পতন জ্ঞান নাই। সূক্ষ্ম সূত্র-কীট উঠিতে পড়িতে লাগিল। আমি বসিয়া থাকি।

ক্রমে সেই সূত্রগুলি স্ফীত হইতে লাগিল, একদিক্ কিছু স্থূলতর হইল। তখন সেই দিক্ মুখ বলিলে বলা যায়। পূর্ব্বে সূত্র-কীটগুলি নিমেষ কাল স্থির থাকিতে পারে নাই; এখন বয়ঃপ্রাপ্তে কথঞ্চিৎ স্থির হইল, আর জলের উপরি মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায়। দুই একদিন পরে একটী মৃতবৎ ভাসিয়া রহিল, কচিৎ কিঞ্চিৎ চেতনা-যুক্ত বোধ হয়, কখনও বা একেবারে জড়বৎ। আমার শয্যা হইতে উঠিতে কিছু বিলম্ব হয়, পরদিন উঠিয়া দেখি, একটী মশক শিশির মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতেছে. আর জলোপরি একটী

ক্ষুদ্র কীটনির্মোক ভাসিতেছে। একটী, দুটী, তিনটী, চারিটী করিয়া ক্রমে আমার এক শিশি মশা হইল। আমার বিজ্ঞান-পরীক্ষার সার্থকতা অবলোকনে আমি পরিতুষ্ট হইলাম। একদিন নশীবাবুর গৃহিণীর স্বহস্ত প্রস্তুতীকৃত পায়শ পিষ্টক সেবনে চিত্তের কিছু প্রশস্ততা লাভ করিলাম। সুন্দর উদর-পূর্ত্তি না হইলে মানবের উদারতা হয় না। সেদিন সন্ধ্যার পর উদার মনে একে একে ছিপি খুলিয়া সেই পতঙ্গগুলিকে বিপুল বিশ্বে বিচরণ করিতে দিলাম। শিশিটী সরকারদের ছাদের উপর ফেলিয়া দিলাম, চূর্ণীকৃত হইয়া গেল। জীব-রহস্যোদ্ভেদ হইল। এইরূপে জন্ম যে জীবের, সেই জীব আমাকে আজি বিরক্ত করিল, আমার নেশা দূর করিয়া আমাকে লেখকের আসনে বসাইল। একেই বলে মানবের অহঙ্কার। But man is the Lord of Creation—but না yet! *

---

* শুনিয়াছি এই ইংরাজি কথা কয়টীতে ব্যাকরণের তর্ক আছে। দুইটী ইংরাজি অব্যয়ের তর্ক আছে। অব্যয় লইয়া এত বাক্যব্যয় করিতে কমলাকান্তের মত নব্যর পারে,—অব্যয় পারে না। বাতুল জ্ঞানবাপীর জল আনিয়া মশা করিতে যায়। সেই জল স্পর্শ করিলেই যে, জীব মুক্ত হয় তাহা জানে না! আর নবদ্বীপের শ্রীমহাপ্রভুর মেলার যে কিরূপ বিদ্রূপ করিয়াছে, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীশ।

বাস্তবিক মনুষ্যের এই অহঙ্কারের কথাটী মনে হইলে এত মশায় কামড়ে হাসি পায়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস স্বকলমে কলমবন্দী করিলেন যে, "ব্যাসস্তু নারায়ণঃ স্বয়ং।" ইংলণ্ডের অন্ধকবি লিখিয়াছেন যে,—

"গদ্যে পদ্যে অচেষ্টিত সাধন সাধিব।"

আমাদের বাঙ্গালির সাহিত্য-বিপাক-বিপত্তে মধুসূদন শ্রীমধুসূদন লিখিয়াছেন যে,—

"—রচিব মধুচক্র
গৌড়জনগণ যাহে আনন্দে করিবে
পান সুধা নিরবধি।"

মানবাবতার মহাপ্রভু হর্শেল লিখিলেন যে, "মানব—সৃষ্টির মহাপ্রভু।" আমি কমলাকান্তও মধ্যে মধ্যে উত্তম পুরুষের গৌরব গান করিয়া থাকি। এ সকল কি হাস্যকর নহে? সত্য সত্যই কি মনুষ্য সৃষ্টি-কাণ্ডে একেশ্বর প্রভু? এই যে ভারতবর্ষে বৎসর বৎসর সহস্র সহস্র প্রাণী আশীর্বিষ-বিষে তড়িৎ-গতিতে শমন-সদনে রপ্তানি হইতেছে,—yet man is the Lord of Creation! এই যে কোথাও একটী ক্ষিপ্ত শৃগালের দৌরাত্ম্য হইলে অমনি শত শত সাপ্তাহিক পত্রে পোলিশের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকটিত হইতে থাকে,—yet man is the Lord of Creation!

এই যে বিডন সাহেবের বেলবিডিয়র বাসে চিত্র-প্রদর্শনের প্রথম দিনে, একটী শার্দ্দূলের পিঞ্জর-দ্বার অবদ্ধ ছিল বলিয়া শত শত শ্বেত পুরুষ উর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপর হইলেন, বিবিদের ত কথাই নাই,—yet man is the Lord of Creation! যে মানব বাতবৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য অনবরত গৃহ রচনা করিতেছে, কীট পতঙ্গ বিনাশের জন্য দিবারাত্র যন্ত্র সৃষ্টি করিতেছে, তাহার এরূপ আত্মগরিমা ভাল দেখায় না। সাগরের জল-বুদ্‌বুদ্ সাগর শাসক নাম ধারণ করিলে ভাল দেখায় না। ভীষণ মারীভয়ে গ্রাম নগর দেশ অঞ্চল নির্ম্মানব হইতেছে, তবু বলিবে মানব সৃষ্টির একেশ্বর! ব্যোমদেবের নিশ্বাস প্রশ্বাসে চীন হইতে পীরু উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে, তবু বলিবে মানব বিশ্বসংসারের একেশ্বর! দেবী ধরণীর হৃদয়াবর্ত্তভরে উদ্গীরিত বহ্নিরাশি জীব-কাঙ্কাল-পরিপূরিত জনপদ জলন্ত কবরে প্রোথিত করিতেছে, তবু কি বলিতে হইবে যে, মানব বিশ্বরাজ্যের রাজা। আর এই মৃদু মধুর-তারস্বরানুকরণকারী অণুপতঙ্গে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, —তথাপি আমাকে বলিতে হইবে যে, আমি ও আমার স্বজাতিগণ প্রকৃত ধরাধিপ। এ অনৃতবাদে কোন প্রয়োজন নাই। আমি সর্ব্বেশ্বর বলিলেই যদি এই দুর্বৃত্তগণ

দূরীভূত হইত, তাহা হইলে আমি স্বয়ং মশা-বিষয়িণী গাথা প্রকটিত না করিয়া, কমলাকান্তের স্তব রচনা করিতাম। কিন্তু এই দুর্বৃত্তগণ হর্শেলের ন্যায়-শাস্ত্রের বলবত্তা বুঝিতে পারে না; অতএব আজি আমি বাঙ্গালির ন্যায়-শাস্ত্রের সহায় গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে দূরীভূত করিব। বাঙ্গালির ন্যায়শাস্ত্রের অর্থ 'গালাগালি'। বড় ছোটকে গালি দিবে, ছোট বড়কে গালি দিবে, সমানে সমানে গালাগালি চলিবে, ইহার নাম argument বা যুক্তি। আমি এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া আজি কলির মশামেধ-যজ্ঞে এই পূর্ণাহুতি প্রদান করিলাম।

রে কীট প্রভৃত ক্ষুদ্র পতঙ্গ! অভিমানী মানবের তুই চির শত্রু, কমলাকান্তকে আর জ্বালাতন করিস্ না। কমলাকান্ত সন্ন্যাসী অভিমানের সঙ্গে তাহার চিরশত্রুতা। দূর হ রে! পতঙ্গ-মশক। আর দূর হ রে! মানব-মশক।

ক্ষুদ্র কীট, তোর গুণ্ গুণ্ মধুর সমালোচন, তোর অকারণ পৃষ্ঠ-দংশন, নীরবে শোণিত-শোষণ—আর আমার সহ্য হয় না। তামস-প্রিয়! তুই অন্ধ হইতে আর আলোকে দেখা দিস্ না। কোণ-প্রিয়! সমাজে যেন তোকে আর দেখিতে না হয়। সন্ধ্যামোদি! দিন-দেবের রাজত্বকালে তুই আর কদাপি নির্গত হইস্ না। কর্দ্দমে, জঙ্গলে, বনে,

পূতিগন্ধে, পয়োনালীতে তোর জন্ম—অন্ধকারে নিভৃত লূতা-নিকেতনে, শয়নতলে তোর আবাস; পৃষ্ঠ-দংশনে আর শোণিত-শোষণে তোর আমোদ—পক্ষ হেলনে, পক্ষ কম্পনে মৃদু গুণ্ গুণ্ রব তোর তোষামোদ গান। কিন্তু কে তোর এ রবে মোহিত হইবে? যে হয়, সে হউক, কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী কখন মোহিত হইবে না। তোরা আমাকে জ্বালাতন করিয়াছিস্। অল্পপ্রাণ পতঙ্গ! ক্ষীণ জীব! তুই প্রভাকরের প্রভায় নষ্টপক্ষ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ'স্, শীত-সঞ্চারে পলায়ন করিস্, সমীরণের ঈষদ্বেগে কোথায় চালিত হ'স্, তাহার স্থিরতা নাই, দেবানন্দ সুগন্ধ সজ্জরসধূমে তোর ধ্বংস হয়। রে কীটস্য কীট পতঙ্গাধম, অদ্য হইতে তোকে যেন আর সম্মুখে বা পৃষ্ঠে না দেখিতে হয়, আর অদ্য হইতে যেন কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীকে সামান্য মশা-বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ভীষণ মহাদপ্তরে মসীবর্ষী ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপ না করিতে হয়। মশা মারিতে নিত্য কামান পাতিলে লোকে বলিবে

কাপুরুষ—কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

কুঞ্জ সরকার

কুঞ্জ সরকারকে কুঁজো মহাশয়ও বলিত। তিনি বাস্তবিক কুব্জ ছিলেন। কুঁজো মহাশয়ের নামে ও আকৃতিতে এইরূপ সাদৃশ্য লইয়া রাঢ় অঞ্চলে একটা বড় গণ্ডগোল ছিল। একদিন একজন পড়ো গাছে চড়িয়া আমড়া পাড়িতেছিল, কুঞ্জ সরকার তাহাকে কিছু অতিরিক্ত ভর্ৎসনা করেন; শেষে বলিয়া ফেলেন যে, "ঐরূপ আমড়া-ধরা গাছে চড়িয়াই আমার এহেন দুর্দ্দশা, তুই আবার ঐরূপ গাছে উঠিলি?"

এই দিন হইতে মহাশয়ের নামের ও আকৃতির সাদৃশ্য লইয়া মহা গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। মহাশয় যদি জন্ম-ধারণের পর হইতেই কুঁজো নয়, তবে উঁহার কুঞ্জ নাম হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের নানা জনে নানারূপ মীমাংসা করিত। কেহ বলিত, "মহাশয় বড় সেয়ানা, কুঁজো হওয়ার পর হইতেই আপনার গ্রাম বদল ও নাম বদল করিয়াছে; মনে ভাবিয়াছে যে, লোকে ত কুঁজো বলিবেই, তবে কুঞ্জ নাম লওয়াই ভাল।" মুরুব্বিরা বলিতেন যে, উঁহার জন্মের পর গণকে গণিয়া বলিয়া দেয় যে, ও কুঁজো হইবে, তাহাতে

বৃশ্চিকরাশিতে জন্ম, কাজেই বাপমায়ে ককারের নাম দিতে গিয়া আদর করিয়া কুঁজো বলিয়া ডাকিত। কেহ বলিত,—না, উহার মামড়া-ধরা আমড়া গাছ হইতে পড়ার কথাটা একেবারে মিথ্যা, ওটা পড়ো-শাসনের ছলনা। অমন মিথ্যা কথা, ও রোজ সাড়ে সতর গণ্ডা কয়। মীমাংসকেরা বলিতেন যে, ও বরাবরই একটু কুঁজো ছিল বটে, আমড়া গাছ হইতে পড়িয়া অবধি একেবারে কাঁদিশুদ্ধ কলাগাছ ভাঙ্গার মত হইয়াছে। এইরূপে নানা জনে নানা কথা কহিত। রাঢ় অঞ্চলে কুঞ্জ সরকারের কুব্জাকৃতি লইয়া বড়ই একটা গণ্ডগোল ছিল। একজন গুরুমহাশয়ের নাম লইয়া একটা অঞ্চলের লোক গণ্ডগোল করিত, এ কিরূপ কথা? তাহা যদি না হইবে, তবে তাহার কথা কে লিখিতে যাইত? আরও ত শিক্ষক রহিয়াছেন, শ্লেট ভাঙ্গিয়া কাষ্ঠ লইয়া, সেই কাষ্ঠখণ্ড আবার ছাত্রের পৃষ্ঠে ভাঙ্গিতেছেন, কৈ কাহারও নামে প্রবন্ধ লেখা গেছে কি? না, ক্ষণজন্মা লোক না হইলে তাহার স্থান-জন্মের কথা ভাবিবই বা কেন? আর দশের কাছে শাদা কাগজ কালো করিয়া ছাপিতে যাইবই বা কেন? না, কুঞ্জ সরকার এক সময়ের এক প্রদেশের প্রসিদ্ধ লোক বলিয়াই তাহার পরিচয় দিতে আমরা প্রয়াস পাইতেছি।

আমড়া গাছের ঘটনা না ঘটিলে, কুঞ্জ সরকারকে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘাকৃতি মানুষ বলা যাইত। এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে মানুষ বলাই একরূপ কবিত্ব। তিনি দ্বিপদ হইয়াও প্রায় চতুষ্পদ। কোমরটা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে শরীরটা মাটামের মত হইয়াছে, হাত দুখানা আর একটু হইলেই ভূমিতে ঠেকিত। শরীরটা আসল তিন ভাঁজ। প্রথম ভাঁজ অবশ্য পা হইতে কোমর পর্য্যন্ত; ঠিক খাড়া। তার-পর কোমর হইতে কণ্ঠা,—দ্বিতীয় ভাঁজ; সমতল। তৃতীয় ভাঁজ মুখখানা; আবার বেশ খাড়া। সেই মুখের উপর দুই চক্ষু:—

সিঁদূর ত সবাই পরে,
সিঁদূর কপাল-গুণে ঝল্‌মল্‌ করে।

মুখের উপর দুই চক্ষু, অনুমান করি, অন্ধ ও কাণার ছাড়া আর সকলেরই আছে। কিন্তু কুঞ্জ সরকারের সেই দুই চোখ, আর তোমার আমার চোখ? ভাষা সঙ্কীর্ণ; তাই সেই হৃৎপিণ্ড-পরীক্ষক লৌহশলাকাসমষ্টি আধারের নামও চক্ষু, আমার কপালের নীচের এই পীতপিঙ্গল পরকলাও চক্ষু, আর, (রুচি বাঁচাইতে গেলে) ঐ ঘুম-মাখান, ঘুম-ভাঙ্গান মন্ত্র মণিদ্বয়ও চক্ষু। বাস্তবিক কিন্তু এ সকল এক পদার্থ নহে। কুঞ্জ সরকারের চক্ষু জ্যোতির্ম্ময় এ কথা যে

বলিতে হয়, বলুক, কিন্তু আমরা তাহা বলি না; কেন না, আমরা জানি কুঞ্জ সরকারের ছাত্রদের বোঝা বোঝা শোলা আনিতে হইত এবং কোন দিন দৈবাৎ পড়োরা শোলা পোড়াইয়া রাত্রির জন্য রাখিয়া না গেলে, পরদিন অন্ততঃ দশ পনের জন কঠোর বেত্রাঘাতে দণ্ডিত হইত। কুঞ্জ যে তীব্র দৃষ্টিতে লোকের চালের লাউ কুমড়া দেখিতেন, তাঁহার চক্ষুতে তেজ থাকিলে অবশ্যই নিত্য লঙ্কাকাণ্ড ঘটিত। না, মহাশয়ের চক্ষু তেজোময় নহে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি ওদুটা কেবল নিরাকার লৌহশলাকাময়। সেই শলাকার দ্বারা তিনি লোকের হৃৎপিণ্ড মানসে ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার মধ্যে ভয়, ভক্তি, ভালবাসা, ভণ্ডামি কতটুকু আছে তাহা বুঝিতে পারিতেন। সেই চক্ষু নিয়তই ঘুরিতেছে,—দক্ষিণে বামে, সম্মুখে, নিম্নে সকল দিকেই ঘুরিতেছে কিন্তু কখন উপর দিকে যাবে না। অনেকে বলিত যে, কুঞ্জ সরকার ঐহিক, পারত্রিক কোনরূপ উপরওয়ালা মানেন না বলিয়াই তাঁহার দৃষ্টিও কখন উপরের দিকে উঠে না। কিন্তু কুঞ্জ সরকারের সম্বন্ধে ও কথাটা যে বড় ধরা আবশ্যক, তাহা আমরা বিবেচনা করি না। কেন না, তাঁহার চক্ষু উপর দিকে ঘুরিলেও দৃষ্টি কখনই ভ্রূ ছাড়াইয়া উঠিতে পারিত না। খড়খড়ে জানালার উপর বাহিরের দিকে দেওয়ালের

গায়ে যেমন কাঠের গড়নের টপ থাকে, কুঞ্জ সরকারের খুব কাল, খুব ঘন মোটা চুলের ভ্রূজোড়াটী সেইরূপ তাঁহার চক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। সেই ভ্রূকে আর দু'জোড়া গোঁপ বলিলেই চলে। সঙ্কল্পবাদীরা বলেন যে, চক্ষুতে কুটিকাটি না পড়িতে পারে, এই জন্য মনুষ্য-ললাটে ভ্রূ দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে কুঞ্জ সরকারের বেলায় ধাতার সে সঙ্কল্প যে সুসিদ্ধ হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়,—কুটিকাটা দূরে থাকুক, টিকটিকি আরশোলাও মাথার উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িলে, সেই ভ্রূজালে বাধিয়া থাকিত। তারপর সেই নাসিকা, সেত খগ-দর্প-নাসিকা নহে, নগ-দর্প-নাসিকা; অটুট, অনড়, অসাড়, মুখ-মণ্ডলের মাঝে সিংহল-দ্বীপের আদিম শিখরের মত দাঁড়াইয়া আছে, আর বন জঙ্গল কর্দ্দম পিচ্ছিল পরিপূর্ণ দুই গুহা নিম্নে হাঁ হাঁ করিতেছে! আর সেই নাসিকার সেই পাঠশালার আটচালার কলরবভেদী গর্জ্জন! জগজ্জগতের কেমন আশ্চর্য্য কৌশল, সেই গর্জ্জনেই ছাত্রগণের সন্ত্রাস এবং নিকটস্থ বাপীকূল-সমাগত যুবতী-প্রৌঢ়াগণের হাস্য-পরিহাস! গর্জ্জনের পর বর্ষণ আছে বলিয়াই ছাত্রগণের গর্জ্জনে সন্ত্রাস।

আহারের পর কুঞ্জ মহাশয় একখানি পড়ো মাদুরি বিছাইয়া, চালার শালের খুঁটিতে একখানি পিঁড়ে লাগাইয়া, তাহাতে

ঠেসান দিয়া বাম হাঁটুর উপরে দক্ষিণ পা রাখিয়া ভোরপুর গুড়ক সেবা করিতে করিতে একেবারে বিশ্রাম করিতেন। চক্ষুর চঞ্চলতা ক্রমে সম্বরণ করিয়া, স্তম্ভলম্বিত বেত্রদণ্ডে স্থাপিত করিতেন। তখন তদীয় সেই বেত্রনিহিত একদৃষ্টি দেখিলে ভাবুক অবশ্যই বুঝিতেন যে, কুঞ্জ মহাশয় সার বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার ইহকাল, পরকাল, সকাল, বিকাল—সকলই সেই বেত্রের ভরসা; বুঝিতেন যে, কুঞ্জ মহাশয় একান্ত মনে ভাবিতেছেন;—

ত্বয়া বেত্রদণ্ড-করস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

এই নিধিধ্যাসনের পর সমাধির গর্জ্জন। গর্জ্জন যদি হঠাৎ একটু থামিল, তবেই অমনই পার্শ্বস্থিত ছপ্‌টি, প্রকৃতির বারি-বর্ষণের মত যেখানে সেখানে পাত্র-নির্ব্বিশেষে ছাত্র-গণের শরীরে পতিত হইবে। সুতরাং গর্জ্জনের পর বর্ষণ নিশ্চয় জানিয়া ছাত্রেরা গর্জ্জনে বিষম সন্ত্রস্ত ছিল। আর, যুবতীর হাস্য পরিহাস? তা পুরুষের অনেক গর্জ্জনেরই ঐরূপ পরিণাম—কুঞ্জ সরকারের নাসিকার তাহাতে বিশেষ সৌভাগ্য বা 'দৌর্ভাগ্য' নাই। স্ত্রীলোকেরা জানিত যে, নিম্ন গহ্বরের গর্জ্জনকালে উচ্চ কোটরের লৌহশলাকা সকল নিস্তব্ধ থাকে; তাঁহাদের সেই লাভ। অভ্যাসবশতঃ

গুরুমহাশয় নর-নারী পশুপক্ষী এমন কি গাছ পাথর পর্যান্ত তাঁহার পড়ো বলিয়া মনে করিতেন; সেই নব বেদান্ত-জ্ঞানেই তিনি বাপীকুলাগত রমণীকুলের উপর তীব্র দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন। তাহারা কিন্তু ভাবিত যে, কাঁধের কাছে কাপড় একটু ছেঁড়া আছে, বাম পদের বাঁকমল একটু ঢিলা হইয়াছে, কপালের টিপ একটু বাঁকা হইয়াছে, দুষ্ট গুরুমহাশয় বুঝি তাহাই দেখিতেছে। মহাশয়ের সহিত নারীগণের বিরোধ হইবারই কথা। তা সকল দেশেই হয়, মহাশয়দের সহিত মহাশয়দের বিরোধ ত চির প্রসিদ্ধ। বালিকারা পাঠশালার আশে পাশে দৌড়িয়া বেড়ায়, মহাশয় তাহা অবশ্য সহ্য করিতে পারিতেন না। কখন এক আধটীকে পড়ো দিয়া ধরিয়া আনিতেন, তাহারা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইত, ছেড়ে দিলেই দূরে গিয়া এক চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে 'পোড়ারমুখো মহাশয়' বলিত। যুবতীদের সহিত আরও ঘোরতর বিবাদ। কুঞ্জ public instructor' অর্থাৎ সরকারি গুরুমহাশয়, যুবতীরা প্রত্যেকেই private tutor অর্থাৎ খাসগুরু। অথচ উভয়েরই মনে বিশ্বাস আছে যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই জগৎ-গুরু। এই প্রথম বিরোধ। তার পর কুঞ্জ মহাশয় কদাকার, কুব্জ, কঠোর; যুবতীরা 'কান্তি-মতী, কমনীয়া ও কোমলা। ইহাতে দ্বিতীয় বিরোধ। মহা-

শয় বেত্র-বল, মহাশয়াগণ—(বলিতেই হইতেছে) নেত্র-বল; আর বাড়াবাড়িতে কাজ নাই, সুতরাং যুবতীগণের সহিত মহাশয়ের নানাদিকেই বিরোধ। আর প্রৌঢ়ারা ত একেবারেই গুরুমহাশয়কে দেখিতে পারিতেন না। সোণার গোপালের পিঠ যে দুবেলা দাগড়া দাগড়া করিয়া দেয়, তাহাকে কখন গোপালের মা ভাল বলিয়াছেন কি? না, এ দেশে মাতৃশরীরে শাসনের ভাব কখন দেখা যায় নাই। আমাদের দেশের ভদ্রসন্তানগণের দুর্দ্দশা, প্রধানতঃ মায়ের আদরে, ঠাকুমার প্রশ্রয়ে, পিসিমার গুণেই হইয়া থাকে। মা যে সেই মুখখানি কাঁদ কাঁদ করিয়া কোলে বসাইয়া বস্ত্রাঞ্চলে কপাল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "হোক মেনে একটা যেন অকাজই করিয়াছিল, তা এমনই করে কি লাঞ্ছনা করে গা?—শরীরে কি একটু দয়া নাই?" সেই দিন হইতেই ছেলের পরকাল খসিতে লাগিল।—তা খসে খসুক,—আমরা কেন আসল কথা হইতে খসিয়া পড়ি?—প্রৌঢ়ারা গুরুমহাশয়কে একেবারেই দেখিতে পারিতেন না। বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা,—বালক, যুবক, বৃদ্ধ কেহই দেখিতে পারুক আর নাই পারুক, অথবা দেখিয়া হাসুক বা কাঁদুক, তাহাতে কুঞ্জ সরকারের বড় একটা দৃক্‌পাত ছিল না। আটচালার মধ্যে হইলে, বেত্রপাত ছিল।

যুবতীরা মহাশয়ের খাস রাজধানীর মধ্যে আসিতেন না,—তাই রক্ষা। গুরুমহাশয় কাহাকেও দৃক্‌পাত করিতেন না, কিন্তু দুইটী পদার্থে তাঁহার হৃৎপাত হইত। বোস্ বাগানের তলার পথ দিয়া যাইতে হইলে দিনের বেলাতেই তিনি জড়সড় হইতেন, রাত্রিকালে সর্ব্বত্রই তাঁহার সমান ভূতের ভয় ছিল।

তোমরা সকলেই বলিতেছ কুঞ্জ সরকার ফুটিতেছে না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই ভরাভাদ্রের দুর্দ্দিনের দুর্য্যোগ-সময়ে, তুমি কোন্ কুঞ্জে কয়টা ফুল ফুটন্ত দেখিতে পাও? কৃষ্ণকলি জলপ্রপাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, দোপাটির চারা ডাঁটাসার, পাপড়িগুলা মাটিতে পোঁত পড়িয়াছে; রজনীগন্ধ নববিধবার মত বিষণ্ণ শুভ্রচ্ছদে নতমুখে চোখের জলে মাটি ভিজাইতেছে; গোলাপের বৃন্তগুলি আছে, পাপড়ি নাই; রাশীকৃত কুন্দ কাদামাখা হইয়া অনাদরে তলা বিছাইয়া পড়িয়া আছে।

আমাদের কুঞ্জ সরকারের সময়, রাঢ় অঞ্চলে এমনই দুর্যোগ, এমনই দুর্দ্দিন। তখন ললাটী, কপালী, নাক-কাটী, বিশালী, চোরচণ্ডী, রণঝণ্ডী, রঙ্কিণী, শঙ্খিনী প্রভৃতি দেবীমূর্ত্তিসকল দস্যুকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিতা হইয়া জাগ্রৎভাবে শীধু-মাংস-পশু-প্রিয়া নামের সার্থকতা করিতেছেন। তখন

বাগ্‌দী ডোম চৌকিদারে দিনে দুপুরে দীঘির পাড়ে হত্যা করে; দারোগার জমাদারের বক্‌সির নায়েব হিসাব করিয়া আপনার এবং উপরওয়ালার মাসোয়ারা গণ্ডা দস্যুদের স্থানে বুঝিয়া লয়। বিষ্ণুপুর-রাজের তিনশত ষাট শিব-মন্দিরে তখন দস্যুদলই নিত্য অতিথি। তখন মন্দিরের পূজারী দস্যু, সেবক দস্যু, কামদার দস্যু, ভাণ্ডারী দস্যু। সরকার বাহাদুর সিপাহী পাঠাইয়া এই দস্যুতা নিবারণের উদ্যোগী হইয়াছেন। ক্রমে বিষ্ণুপুরের উপর তাঁহাদের শুভদৃষ্টি পড়িয়াছে। ষাট ওয়ালি জমা একে একে বাজেয়াপ্ত হইতেছে; বিষ্ণুপুরকে বনবিষ্ণুপুর করিয়া মদনমোহন বাগবাজারে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার গুপ্ত বৃন্দাবন এরণ্ডবন হইতে লাগিল।

রাঢ়ের এমনই দুর্দ্দিনে কুঞ্জ সরকারের আবির্ভাব বা স্থিতিভাব। তখন লাঠির জোরে রাঢ় অঞ্চলে যে ফুল যে ভাবে ফুটিয়াছিল, তাহার নামগন্ধ আমাদের কুঞ্জ সরকারে নাই। আর তোমরা যাহাকে 'ফুটন্ত' বল তাহাও কুঞ্জ সরকারে নাই। যদি অলৌকিক শক্তির হঠাৎ আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়রসে চক্ষু বিস্ফারিত করাই সহজ সাহিত্য-পাঠের চরম আনন্দ বলিয়া তোমার ধারণা থাকে, তবে আমাদের কুঞ্জ সরকারে তাহা পাইবে না। তথাপি

বলিয়া রাখি কুঞ্জ সরকার এক সময়ের এক অঞ্চলের প্রসিদ্ধ লোক।

কুঞ্জ সরকার ক্ষণজন্মা বলিয়া একব্রতী কি না তাহা বলিতে পারি না, লোকে তাহাই বলিত; কিন্তু এতটুকু বলিতে পারি যে তিনি একব্রতী বলিয়াই প্রসিদ্ধ। শাসনের সহিত শিক্ষাদানই কুঞ্জ সরকারের এক কার্য্য, এক ব্রত এবং সমস্ত জীবন। তবে জীবন ধারণের জন্য দুই চারিটী নিত্য কর্ম্ম ছিল বটে।

দিবা দ্বিপ্রহরের পর কুঞ্জ মহাশয় দরিয়া-দীঘিতে স্নান করিতেন। স্নানের পর একবার সেই ত্রিভঁাজ শরীর বক্র করিয়া সূর্য্য প্রণাম করিতেন; সেই তাঁহার একমাত্র প্রকাশ্য আহ্নিক। দিনান্তে একবারও সূর্য্যদেব দেখা দিলেন না, এমন হইলে, অবশ্য পাঠশাল বন্ধ থাকিত; কুঞ্জ মহাশয় সে দিন আহার করিতেন না। সেইজন্য লোকে আরও বিশ্বাস করিত যে, কুঞ্জ মহাশয় সূর্য্যোপাসক। স্নানের পর রন্ধন। পড়োয়া যে দিন যাহা যোগাড় করিয়া দিবে, কুঞ্জ মহাশয় সে দিন তাহাই রন্ধন করিবেন। আহারের সঞ্চয়ভাণ্ড বা ভাণ্ডার কুঞ্জ মহাশয়ের ছিল না। তবে হাঁড়িতে দুটী পর্য্যুষিত অন্ন এবং তিজেলে একটু তেঁতুলের চাঁচি বার মাসই তাঁহার থাকিত। আহারের পর তাঁহার

'কেলোকে' দুই থাবা অন্ন দিতেই হইবে। কেলো কুকুর তাঁহার পুষ্যি পড়ো। কেলো কসিতে বা ঘুসিতে পারিত না বটে, কিন্তু মহাশয় তাহার সেই মহা ভ্রূ একটু কাঁপাইয়া, সেই অধরোষ্ঠের দক্ষিণ-কোণ একটু প্রসারণ করিয়া—একটু যেন গর্ব্বে, একটু যেন আহ্লাদে বলিতেন, "কেলো তরিবতে অনেক পড়োর চেয়ে ভাল।"

'নীতি' বা 'শিক্ষা' এই দুইটী কথা, গুরুমহাশয় চাণক্য-শ্লোক পড়ানর সময় ছাড়া বোধ হয়, আর কখনই মুখে আনিতেন না। তিনি বলিতেনও তরিবৎ, বুঝিতেনও তরিবৎ। পড়োর তরিবৎ ভাল হইলেই সে মহাশয়ের পরম প্রিয় হইত। যখন এরূপ কোন ছাত্রকে তিরস্কার করিতেন, তখন বলিতেন, "সোঁদর গাধা।" যাহাদের তরিবৎ হয় নাই, তাহাদের বলিতেন, "বাঁদর গাধা।" যে সব বয়স্ক ছাত্র তরিবতে তাঁহার প্রিয়, তাহাদিগকে বামে লইয়া বসিতেন, এবং উল্লাসের সহিত তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। নৌকা আঁকিয়া কাঁড়ে দীঘের মাপ বুঝাইতেন, 'ছাঁদে যত বাঁধে তত' কথার অর্থ বলিয়া দিতেন। রাস-মণ্ডলের চারি-ধারে থাকে থাকে ষোলশ গোপিনী সাজাইয়া মধ্যে শ্রীমতীকে রাখিতেন। তাহার মধ্য হইতে থাক বদলাইয়া শ্রীকৃষ্ণ দুই শত গোপিনী লইয়া নিধুবনে গেলেন, অথচ

শ্রীমতী দেখিতেছেন যে, সেই ষোলশ গোপিনী তাঁহার সম্মুখেই আছে। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেম-রহস্যের গণিত-রহস্য কুঞ্জ মহাশয় ধীরে ধীরে ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিতেন। সেই সময়, ছোট ছোট ছেলেরা একদিকে দাঁড়াইয়া 'কুঞ্জ-খেলার' আর্য্যা বলিত —

দেখ, শ্রীরাস মণ্ডলে ছিল ষোলশ গোপিনী।
মদনমোহন মাঝে, বামে বিনোদিনী॥
হেথা দুই শত সখী তার পাইয়া ইঙ্গিত,
তমাল কুঞ্জের আড়ে যায় আচম্বিত।
রাইকে, মদনমোহন বলে বচন মধুর,
ডেকেছে আমারে মধু মঙ্গল ঠাকুর।
আমি, ঝটিতি আসিব ফিরে সাঙ্গাতি শুনিয়ে,
যেখানেতে যত সখী দেখহ গণিয়ে।
তখন, দলে দলে রাখি সখী রাধিকা গণিল,
চৌদিকে চৌশত দেখি ষোলশ বুঝিল।
হেথা বুঝিয়া লইল রাই সর্ব সখীগণে;
দুই শত লয়ে কানু, গেল নিধুবনে।
হোথা কুঞ্জ খেলে গোপীচুরি লীলা চমৎকার।
কুঞ্জ-খেল ভেঙ্গে দিল কুঞ্জ সরকার॥

এখনও তোমরা বেশ মুচ্‌কি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া

বলিতেছে,—কুঞ্জ সরকার ফুটিল না,—তবে তোমাদেরই জিজ্ঞাসা করি, কি ভাবে, কোন ছাঁদে, কোন্ ভাষায় কুঞ্জ সরকারকে ফুটাই বল দেখি ?

কুঞ্জ সরকার সরোবরের কমলিনী নহে যে, ধীর-মলয়-সমীর-সঞ্চারে, গুঞ্জনমত্ত মধুব্রতের ঝঙ্কারে, প্রভাত অরুণের তরুণ কিরণে ধীরে ধীরে ফুটাইতে থাকিব ; সরোবরের ঘাটও নহে যে, আগ্রীব-নিমজ্জিতা অর্দ্ধাব-গুণ্ঠন-গুণ্ঠিতা, দ্বাদশী, চতুর্দ্দশী, ষোড়শী, পূর্ণিমা বা অমা-বস্যা'র চাঁদের হাট ঘাটে আনিয়া বাপীকূল প্রস্ফুটিত করিব। জল ছাড়িয়া স্থলে চল ;—কুঞ্জ সরকার বেলি চামেলি নহে ; যে, শ্বেত শোভায় হাসিতে হাসিতে সন্ধ্যা-সমীরণে দুলিতে দুলিতে ফুটিয়া উঠিবে। রাজপথের ধারের দ্বিতল ভবনের বিস্তৃত গবাক্ষ নহে, যে কোলের ছেলে ফেলিয়া রাখিয়া, উনুনের হাঁড়ি আধ-সিদ্ধ নামাইয়া, মুক্তবেণী, যুক্তবেণী যুবতীগণকে ঘোমটা খুলিয়া, লজ্জা উড়াইয়া, দলে দলে আনিয়া দিব ; আর শতদলে উৎপল ফুটিতে থাকিবে। স্থল ছাড়িয়া অন্তরীক্ষে। কুঞ্জ সরকার আকাশের রাঙ্গা মেঘে ভাঙ্গা রোদের খেলা নহে যে, পশ্চিম দিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়া রাশি রাশি শিমুল, পারুল ফুটাইব। সাগরতীরের সন্ধ্যাকালের নক্ষত্র নহে যে, একটী করিয়া মিটিমিটি সরমের

দিঠির মত, সেজুতির দেউটির মত নীরবে ফুটিতে থাকিবে। কুঞ্জ সরকার সীতাকুণ্ডের জল নয় যে, টগ্‌বগ্‌ করিয়া—তুবড়ির বাজী নহে যে, ফর্ ফর্ করিয়া—ফুটিয়া উঠিবে।

কিন্তু মানুষ ত ফুটিয়া উঠে? কুঞ্জ সরকার কেন সেইরূপেই ফুটুক না? তাহাও অসম্ভব। কুঞ্জ সরকার স্বামি-সমীপে প্রথম সমাগতা, নব-বিবাহিতা তরুণী নহে যে, দুরু দুরু বুকে, অবনত মুখে, ধীরে ধীরে বসিয়া, লীলা হেলায় বস্ত্রাঞ্চল টানিতে টানিতে, সরমের আঁখি মরমের সখার দিকে উন্মীলিত করিতে করিতে, বনান্তরালের বনমল্লিকার মত মৃদু মৃদু ফুটিতে থাকিবে। কুঞ্জ সরকার বাগ্বিদ্যাবিশারদ বাগ্মী নহে যে, বঙ্গবাসিনী ব্যভিচারিণীর উপর সমাজের বিপুল যাতনা বর্ণনা করিয়া, হিন্দুজাতির তুষানল ব্যবস্থা করত, হিন্দু-শাস্ত্রসকলকে কলিকাতার কসাই টোলার চীনাম্যানদের বিপণিতে উপানতের আবরণ-উপকরণে পরিণত করিয়া, চোগা দোলাইয়া, বক্ষঃ ফুলাইয়া, দক্ষিণে হেলিয়া, উর্দ্ধহস্তে লম্বকণ্ঠে, বালক যুবকের খর করতালে দুলিতে দুলিতে উৎকট বিকট ভাবে ফুটিতে থাকিবে। না, কুঞ্জ সরকারকে নীরবে, সরবে, গৌরবে, সৌরভে—কোনরূপেই ফুটাইতে পারিতেছি না।

ব্যক্তিবিশেষও বায়ুবিশেষে ফুটিয়া থাকে। ডফ্ ফুটিলেন

হেমনাথ বসুর পালায়, ফীয়ার ফুটিলেন কালী বন্দ্যোর জ্বালায়। বাঁডন ফুটিলেন মহামারীর কটুকে, ইডেন ফুটিলেন পাদরিণীর চটকে। নরেশ ফুটিলেন শালগ্রামে, রমেশ ফুটিলেন গুণগ্রামে। যতীন্দ্র ফুটিলেন ৯ আইনে, সুরেন্দ্র ফুটিলেন বেআইনে। শিবপ্রসাদ ফুটিলেন কৃতাঞ্জলিতে, ভূদেব ফুটিলেন পুষ্পাঞ্জলিতে। টম্‌সন ফুটিলেন ফিরিঙ্গি নাটে, রীপণ ফুটিলেন কঙ্করডাটে। কিন্তু এরূপ ফুটনও ত কুঞ্জ সরকারের ঘটিবে না।

আর ফুটাইবার যে ব্রহ্মাস্ত্র, ব্রহ্মার বরেই হউক, আর দুর্ব্বাসার শাপেই হউক, ঐ দুইটার মধ্যে একটা কারণ অবশ্য হইবে, কুঞ্জ সরকারে তাহা খাটে না। ফুটনকারিণী রমণী-গণের সহিত কুঞ্জ সরকারের চিরবিরোধ, স্থায়ীবিরোধ, এবং সুমেরু কুমেরু ভেদ। অভাগা কুঞ্জ মহাশয়কে ফুটান মহা দায়। রূপ থাকুক আর নাই থাকুক, যদি একজন যেমন তেমনও যুবতী সরকারিণী আনিয়া অর্দ্ধরাত্রে বাজনীহস্তে কুঞ্জ সরকারের পাশে বসাইয়া বলাইতাম, "তুমি ত রহিলে পড়োর পাল লয়ে, এখন মেয়ের বিয়ের কি হবে বল দেখি? শত্রুর মুখে ছাই দিয়া, বিরাজকে যে আর রাখা যায় না।" আর আমরা সেই সময়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পট তুলিতে পারিতাম, তবে দেখিতে কুঞ্জ সরকার ফুটিত কি না ফুটিত?

তাও না হইয়া যদি মহাশয়কে কলির সত্যবান করিয়া একজন সাবিত্রী আনিয়া প্রান্তরস্থিত ভাঙ্গা ঘরে আধুনিক পশুপতি-সংবাদ যাত্রার সাবিত্রী-চতুর্দ্দশী পালার উদ্যোগ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ফুটুক আর না ফুটুক ফুটিবার বাতাস ত লাগিত। যদি সেদিকের পন্থা থাকিত, তবে ঐ বৃহৎ রাঢ় অঞ্চলে, তেমন ডাঁটথাট না হউক একটা ভাঙ্গাচুরা গিরিজায়া আনিয়াও কি সেই কোমল হস্তের সাময়িক সম্মার্জ্জনীর অবতারণা করিয়া কুঞ্জ সরকারকে একরূপ দিগ্বিজয় ফুটন ফুটাইতে পারিতাম না? না, সে দক্ষিণ দিকের মলয় বাতাসের পন্থা গুরু মহাশয়ের আটচালায় নাই। আমাদের কুঞ্জ সরকার ফুটিবে না, নাই ফুটিল। তোমরা কিছু সত্য সত্য বয়সের দায়ে সলমনের কীর্ত্তি-প্রয়াসী নহ, তবে আধ-ফুটন্ত তাচ্ছিল্য করিবে কেন?

সুন্দর-বনে ব্যাঘ্রাধিকার

বহুকাল হইল, সুন্দর-বন অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। এখনও তাহার নানা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। নিবিড় জঙ্গল-মধ্যে প্রস্তরময় সোপানশোভিত বৃহৎ সরোবর, কারুকার্য্য-খচিত বিশাল শিব-মন্দির, ভগ্ন অট্টালিকাসমূহের ক্রোশব্যাপী ধ্বংসাবশেষ সুন্দর-বনের যেখানে সেখানে এখনও আছে। ফরাসী রাজধানী প্যারিস্ নগরে বঙ্গদেশের যে অতি পুরাতন মানচিত্র আছে, তাহাতে সুন্দর-বন-মধ্যে পাঁচটী জীবন্ত নগরের নাম ও চিহ্ন আছে; আর সুন্দর-বনের সমৃদ্ধির কথা বৃদ্ধ জনগণের মুখেও শুনা গিয়াছে। কিন্তু এখন সমস্তই কালকুক্ষিগত। কিসে গ্রাম, নগর, গৃহ, গোষ্ঠ সমস্তই উৎসন্ন গেল? কেমন করিয়া জনাকীর্ণ জনপদ গভীর নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইল?

প্রসিদ্ধ ভূকৈলাসের যোগীকে ভট্টপল্লীর একজন ভট্টাচার্য্য ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। যোগী নিতান্ত স্বল্পভাষী ছিলেন; উত্তরে বলেন, "সুন্দর-বনে ব্যাঘ্রাধিকার হওয়াতে এবং সুন্দর-বন-বাসীরা দুর্ম্মতি বশত ব্যাঘ্র-ধর্ম্ম অবলম্বন করাতে, কালে সুন্দর-বন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে।"

এ কথা বড় বিচিত্র। ইতিহাসে এরূপ আর কোথাও হইয়াছে কি না জানি না। মানুষ ব্যাঘ্র-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, এ কথা বিস্ময়কর ও হাস্যকর। কিন্তু আবার পরিণাম ভাবিলে বোধহয় নিতান্ত বিষাদপূর্ণ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কথাটী যে ভাবে বিবৃত করেন, আমরা সেই ভাবেই বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব। তিনি একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন, যদি তাঁহার বিবরণে কার্য্যকারণের পরম্পরা নির্দ্ধারণে কিছু গণ্ডগোল থাকে, তবে তাহাতে তাঁহার 'দীধিতি' দায়ী।

এককালে চন্দ্রদ্বীপের রাজারা বড়ই প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন। বঙ্গদেশের দক্ষিণ-ভাগ তাঁহারা সমস্তই অধিকার করেন। তখন সুন্দর-বন বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিল। সাগর সন্নিকট হওয়াতে বৈদেশিক নৌ-বাণিজ্যের বড়ই শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠী জাতীয় নিরীহ বণিক্‌গণ ধান্য, তাম্রকূট, মধু, মোম প্রভৃতির ব্যবসা করিয়া অতুল সম্পত্তি করিয়াছিলেন। পৌণ্ড্রবংশীয় অগণিত কৃষিবর্ণের পরিশ্রমে সমস্ত ভূভাগ সম্বৎসর যাবৎ শস্য-শ্যামল থাকিত। ব্রাহ্মণগণ দেব-প্রসাদে ঐহিক চরিতার্থতা লাভ করিয়া পারকালিক সুখাশায় দিনাতিপাত করিতেন। দিবসে প্রান্তরে কৃষকগণের নীরব শ্রম-চালনায়, গ্রাম নগরে বাণিজ্যের উৎসাহময়ী নিরন্তর

গতিতে এবং রাত্রি চারিদণ্ড পর্য্যন্ত দেবমন্দিরের ও বৌদ্ধ মঠ সকলের বাদ্যঘণ্টা রবে সমস্ত জনপদ আকুলিত থাকিত।

সুন্দর-বনের পূর্ব্বে পশ্চিমে বন ছিল। চন্দ্রদ্বীপের রাজারা পূর্ব্বদিকের বন কাটিয়া নগর পত্তন করিতে লাগিলেন, পশ্চিম দিকের জঙ্গল তাড়না করিয়া নবাগত মুসলমানেরা সেনানিবাস স্থাপন করিতে লাগিলেন। দুইদিক্ হইতে তাড়িত হইয়া ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি শ্বাপদ সকল সুন্দর-বন আক্রমণ করিতে লাগিল। এখন এই মহামারীপূর্ণ বঙ্গদেশের কোন কোন পল্লীগ্রামে যেমন দিবারাত্র শৃগালের উপদ্রব হইয়াছে, প্রথম প্রথম, সেই সময়ে সুন্দর-বনে সেইরূপ বাঘের উৎপাত হইল। তবে শৃগালের উপদ্রব অপেক্ষা বাঘের উৎপাত অবশ্য অধিকতর ভয়ঙ্কর। শৃগালে এখন, ছোট ছেলেটীকে তেল হলুদ মাখাইয়া পীঁড়ার উপর রোদ্রে শোয়াইয়া রাখিয়া নবপ্রসূতি পুকুরঘাটে গিয়াছে দেখিলে, ছেলেটীকে বনে লইয়া যায়; ছোট বউকে মাছ ধুইতে খিড়কীর ঘাটে নামিতে দেখিলে, পাশের কচুবন হইতে মাছের পেতে ধরিয়া টানাটানি করে; চৌরী ঘরের মেঝে হইতে পাকা কাঁঠাল মাথায় করিয়া পালায়; কাঁধাকাঁধি করিয়া রান্নাঘরের ঘুলঘুলি দিয়া ইলিশ মাছের হাঁড়ি খায়;

আবার দুই দশটা হয়ে হইলে, যাকে পায় তাকেই কামড়ায়, বাধা বন্ধক মানে না, লোক জনকে ভয় করে না, মারিতে গেলে ঘাড় ফিরাইয়া লাঠি কামড়াইয়া ধরে। এখনকার দিনে এই বিপুল অর্থ-ধ্বংসকারী পোলিস্-প্রহরী-বেষ্টিত বঙ্গ-মণ্ডলে, এই বন্দুক-বেটন-সঙ্গিন-প্রবল সঙ্গিন্ দিনে যখন সামান্য শৃগালের এইরূপ উপদ্রব হইয়া উঠিয়াছে, তখন, সেই সেকালে, সেই শ্রেষ্ঠী পৌণ্ড্রপূর্ণ নিরীহ নিবাসে আবাস-তাড়িত ব্যাঘ্রের উৎপাত যে কি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রথমে ছাগ, মেষ নিঃশেষ হইতে লাগিল; তাহার পর গোষ্ঠে আর বৎসতরী থাকে না, ক্রমে রাখালের গো মহিষ কমিতে লাগিল; দুটী দশটী করিয়া রাখালবালক মারা পড়িল; তাহার পর অবেলায়, রাত্রি বেলায়, সকাল বেলায় মাঠে ঘাটে আর কেহ চলে না। ক্রমে গ্রাম নগরেও ঐ সময়ে চলাচল বন্ধ হইল, কাজেই খর দিনের বেলা ছাড়া আর দোকান পশার হয় না। লোমশ লাঙ্গুল উত্তোলন করত লক্ লক্ করিয়া লালান্বিত দংষ্ট্র-জিহ্বার ক্ষীণ প্রভার শ্মশান আলোকে ভীষণ মুখমণ্ডল ভীষণতর করিয়া বৃহৎ বৃহৎ রাজব্যাঘ্র সকল পথে, ঘাটে, পাঁদাড়ে বিচরণ করিতে থাকে; সহজে ক্ষুধানিবারণের উপাদান না পাইলে গোশালার সন্নিকটে গিয়া ভীম গর্জ্জন

করে, দুই একটা ভীরু গোরু দড়ি ছিঁড়িয়া, আগড় ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়ে, অমনই ঘাড় ভাঙ্গিয়া পীঠে ফেলিয়া লাঙ্গুল আছড়াইতে আছড়াইতে লম্ফে লম্ফে পগারের মধ্যে লইয়া গিয়া উদর পূরিয়া তাহার রক্ত শোষণ করে। ক্রমে গো-সেবক হিন্দু তাহার বহুদিনের অভ্যস্ত হিন্দুয়ানি ভুলিতে লাগিল। রোগা ভাঙ্গড়া বুড় গোরু আর গোয়ালে বাঁধিত না—ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের নজরানারূপে তাহাই রাত্রিকালে গোশালার বাহিরে বাঁধিয়া রাখিত। কিছুদিনে গো মাহিষ, ছাগ মেষ সকলই প্রায় অর্দ্ধসার হইল; দুধ ত আর মেলেই না; চাষীর চাষ বন্ধ হইবার উপক্রম হইল; ছোট ছোট ছেলে পিলে দুধ বিনে মারা পড়িতে লাগিল; তখন সুন্দর-বন-অধিবাসীরা দারুণ অন্ন-কষ্ট আসন্ন দেখিয়া নানারূপ ভাবনা ভাবিতে লাগিল।

তদানীন্তন বুদ্ধিজীবিরা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, মনুষ্য-শরীরে ব্যাঘ্রের মত বল নাই বলিয়া মনুষ্যের এরূপ দুর্দ্দশা হইতেছে; অতএব শরীরে ব্যাঘ্রের মত বল করা নিতান্ত আবশ্যক। ব্যাঘ্র লম্ফঝম্প দিয়া চলে ফিরে, তাহাতেই উহাদের অত বল, অতএব লম্ফ-ঝম্পে চলাফেরা করা নিতান্ত আবশ্যক। রাত্রিতে উচ্চ প্রাচার-বেষ্টিত সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে কবাটে লৌহ অর্গল লাগাইয়া বালক বৃদ্ধ যুবা

ব্যাঘ্রবৎ হুহুঙ্কারে লম্ফঝম্প করিতে লাগিল। দুই দিন এইরূপ হয়, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে; আবার দশদিন কামাই যায়।

ধুতি লট্‌পট্‌ করিয়া ত শার্দ্দূল-কুর্দ্দন হয় না; ব্যাঘ্রের মত অঙ্গচ্ছদ করাই ভাল,—তাহাতে নানাদিকে সুবিধা আছে। এক ত ব্যাঘ্র-ঝম্পের সুবিধা, দ্বিতীয় গরম কাপড়ে শরীরে বলাধান হয়। তৃতীয় আপাদমস্তক লোমশ কাপড়ে দেহ মোড়া থাকিলে, ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে অনেকটা রক্ষা আছে। চতুর্থ ব্যাঘ্র বোধেও ভুলক্রমে ব্যাঘ্র-হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং ভোট কম্বলের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত "বাঘথাব্বা" বানাইয়া সুন্দর-বনের তদানীন্তন বুদ্ধিজীবীরা ও ধনবানেরা তাহাই পরিধান করিতে লাগিলেন। উহাদের মধ্যে একজন সুবুদ্ধি বলিলেন যে, লম্ফের সহায় লাঙ্গুল; বিশেষ পশু, পক্ষী, সরীসৃপ সকল জীবেরই যখন লাঙ্গুল রহিয়াছে, তখন মনুষ্যেরও থাকা চাই. তবে যে স্বভাব হইতে নাই, সেটা কেবল মনুষ্যের বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্য। মানুষের গাত্রে দীর্ঘ লোমও ত নাই, তাহা বলিয়া মনুষ্য কি লোমশ অঙ্গচ্ছদ পরিবে না? সিদ্ধান্ত মত কার্য্য হইল; শুষ্ক বেতস লতায় কম্বল-চির জড়াইয়া তাহাই মনুষ্যের অঙ্গচ্ছদ মেরুদণ্ডের

নিম্নে লাগাইয়া দেওয়া হইল। বিজ্ঞেরা লাঙ্গুলের আর্য্যা স্থির করিয়া দিলেন, পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ হস্ত, পনের বৎসর পর্য্যন্ত এক হস্ত, তাহার পর—

প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে সার্দ্ধদ্বিহস্তকো ভবেৎ।

স্থির হইল যে, ব্যাঘ্রের মত এই লাঙ্গুল ভয়ের সময় হাতে ধরিয়া টানিয়া নত করিতে হইবে; লম্ফ ঝম্ফ কালে-বেতের রোক ছাড়িয়া দিবে, লেজ বাঁকা হইয়া লক্ লক্ করিবে। ক্রমে অবশ্যই ইঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, হাতে পায়ে না চলিলে লক্ লকান্বিত লাঙ্গুলের শোভা হয় না; বিশেষ হাতে পায়ে হাঁটিলে অনেক চলা যায়, স্ফূর্ত্তিতে চলা যায়, আর শীঘ্র হাঁপাইতে হয় না—সুতরাং বুদ্ধিজীবীরা হাতে পায়েই চলিতে লাগিলেন।

এইরূপ করিতে করিতে বুদ্ধিজীবীরা ক্রমেই আচারে ব্যবহারে, আহারে বিহারে সম্পূর্ণ-ব্যাঘ্র-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেন। শরীরের পশম নষ্ট করাই ভুল এই ধারণা হইল। প্রথমে দাড়ি রাখিতে লাগিলেন; তাহার পর মাথায় বড় বড় চুল রাখিলেন; তাহার পর বাঁকা বাঁকা নখ। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে আঁচড় কামড়ের প্রবৃত্তি বাড়িতে লাগিল। ক্রমে স্নান আচমনাদি মনুষ্যের অহঙ্কার-জাত কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। ব্যাঘ্র ভয়েও বটে, ব্যাঘ্র রাজ্যাধিকারী

বলিয়া তাহাদের অনুকরণেও বটে, ক্রমে রাত্রিতে অর্গলবদ্ধ গৃহে কাজকর্ম্ম হইতে লাগিল। তবে যাতায়াতটা দিন দুপুরে চারি পায়ে, লাঙ্গূল নত করিয়াই হইত; সেই সময়ে পথিকেরা কম্বলের "বাঘথাব্বার" ছিদ্র প্রসারিত করিয়া মুখব্যাদান করিতেন এবং লিহলিহ ভাবে লোলজিহ্বা আকুঞ্চন প্রসারণ করিতেন। গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া হুঙ্কারে বলিতেন—"আলুম্." তাহাতে আগমন বার্ত্তা জানান হইত এবং অবলম্বিত ব্যাঘ্র-ধর্ম্মও রক্ষা হইত। বুদ্ধিজীবিগণের দেখাদেখি অনেক গরাব দুঃখীও ব্যাঘ্র-ধর্ম্ম অবলম্বন করিল; যাহাদের কম্বল জুটিল না, তাহারা নারিকেল ছোলের কাঁথার "বাঘথাব্বা" করিল, আর কুটীর মধ্যে গর্ত্ত করিয়া রাত্রিতে তাহারই মধ্যে বাস করিতে লাগিল।

ছাগ, মেষ কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু ব্যাঘ্রের মত মাংস না খাইলে শরীরে বল হইবে কি প্রকারে? অনেকেই আহারার্থ কুক্কুট পালন করিতে লাগিলেন; কুক্কুটগুলা বাঁধিয়া রাখিয়া, লম্ফ দিয়া তাহাই শিকার করা হইত। প্রথমেই ঘাড় ভাঙ্গিয়া আমরক্ত ভক্ষণ করা হইত। ব্যাঘ্রধর্ম্মিগণ বলিতেন, এমন উপকারী পানীয় আর নাই। আর মংসও অনেকে অসিদ্ধ ভক্ষণ করিতেন,—যাহারা ঐরূপ করে, তাহারাই ত বলশালী। ভক্ষ্যগুলার অস্থিপঞ্জর

গৃহমধ্যে ছড়ান থাকিত ; পণ্ডিতে স্থির করিয়াছিলেন যে, উহাতে দূষিত বায়ুর দোষ নষ্ট করে এবং গন্ধে বলাধান হয়।

সুন্দরবন স্বভাবের উপবন-স্বরূপ ছিল ; ক্রমে ভীষণ জঙ্গলে পরিণত হইল। ব্যাঘ্র জঙ্গলে বাস করে সুতরাং মানবগণের জঙ্গলে বাস করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইল। কাজেই কেহ আর জঙ্গল কাটে না ; তাহাতে চাষবাসের হ্রাস হওয়াতে মাঠ ঘাট সমস্তই জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইল। কুক্কুট-গোষ্ঠীর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল ; গ্রামের নিকটস্থ জঙ্গলে পালে পালে বৃহৎ বৃহৎ কুক্কুটগুলা কেবল "কঃ কঃ" করিয়া পাখা ঝট্‌কাইতে ঝট্‌কাইতে উড়িয়া বেড়ায়, আর পালে পালে বনের ডালে ডালে লাফালাফি করে এখন ব্যাঘ্র ত সুন্দর-বনে রাজরাজেশ্বর হইয়াছে। ব্যাঘ্র শব্দের পূর্ব্বে রাজ শব্দ যোগ না দিয়া, কথাটা মুখে আনিতে কেহই সাহস করিত না। সেই অবধি সুন্দর-বনের ব্যাঘ্রের নাম রাজবাঘ (Royal Tiger) হইয়াছে। সুন্দর-বনের বীরগণ সকলেই তখন 'নরব্যাঘ্র,' 'নর-শার্দ্দূল' পদে অভিহিত হইতেন এবং ঐরূপ বিশেষণে শ্লাঘা মনে করিতেন। 'বিদ্যাবাগীশ,' 'ন্যায়বাগীশ' উপাধির যে দুই দশজন ভট্টাচার্য্য ছিলেন, তাঁহাদিগকে কেহ 'বাঘীশ' বলিলে আহ্লাদিত হইতেন।

সবল পৌণ্ড্রেরা অনেকেই 'বাঘ', 'বাঘেয়া' ও 'বাঘচি' উপাধি পাইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিল। এইরূপেই রামধন বাগের এবং কৈলাস বাগদির পূর্ব্বপুরুষের নামকরণ হয়। কেবল বিশেষণ শব্দে বা জাতিবিশেষের নামেই যে সুন্দর-বনে ব্যাঘ্রাধিকারের পরিচয় আছে এমন নহে—'বাগ' পাওয়া, 'বাগিয়ে' লওয়া ইত্যাদি নূতন কিম্বা সেই সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাতে বাঙ্গালার অভিধান পুষ্ট হইয়াছে। সুন্দর বনে ব্যাঘ্রাদিকারের আরও বিস্তর প্রমাণ আছে।

সুন্দর-বন-বাসীরা ব্যাঘ্রধর্ম্মাবলম্বী হওয়াতে ক্রমে ব্যবসা বাণিজ্য উঠিয়া গেল; চাষ-বাস কমিয়া গেল; অনেকেই নির্ধন হইল। কেবল লম্ফ ঝম্ফেই মন, জ্ঞান-চর্চ্চা উঠিয়া গেল, তাহারা মূর্খ হইল। অল্লাহারে শরীরে বল করিতে গিয়া অধিকতর বলহীন হইল; ঘোরতর জঙ্গলে একরূপ জঙ্গল-জ্বর জন্মিল; তখন সেই দারুণ জ্বরে, অর্থাভাবে, পথ্যাভাবে, ক্ষীণপ্রাণে তাহারা কতদিন যুঝিবে? প্রত্যহ সহস্র প্রাণী মরিতে লাগিল, ব্যাঘ্রধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসীরা প্রায় সকলেই উৎসন্ন গেল, আর রাজ-ব্যাঘ্র সকল সেই ভীষণ গহন শ্মশান বনে শৃগাল হরিণ শিকার করিয়া একাধিপত্য রাজত্ব করিতে লাগিল। কথাটা শুনিলে হাসি পায়, ভাবিলে গা শিহরিয়া উঠে!

সমাপ্ত

মুখার্জ্জি বসু এণ্ড কোং

কর্ণওয়ালিশ বিল্‌ডীংস

১নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এই শারদীয়া মহা-পূজার পারম্ভে মহামায়ার কৃপায় আমরাও আট আনা সংস্করণের পসরা লইয়া উপস্থিত। আমাদের পসরায় বাজে মাল নাই,—আছে যা' তার সব গুলিই খাটী জিনিষ। প্রচলিত প্রথামত শুধু নূতন উপন্যাস বা ছোট গল্পের বই প্রকাশ করাই আমাদের আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থ প্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী উপন্যাস ও গল্প পুস্তকের অনুবাদ পুস্তক, বহুমূল্য পুস্তকের সুলভ সংস্করণ প্রভৃতি প্রকাশ ও প্রচার করাই আমাদের সঙ্কল্প। ভরসা—গ্রাহক ও পৃষ্ঠ-পোষকগণের সহানুভূতি।

আশাকরি—বাঙ্গলা পুস্তকের পাঠক মাত্রেই গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া আমাদের অনুগৃহীত ও উৎসাহিত করিবেন।

এই সংস্করণের—২য় গ্রন্থ—তোড়া (যন্ত্রস্থ)

প্রথিতযশা ও মনস্বী লেখক, উড়িষ্যার চিত্র ও ধ্রুবতারা প্রণেতা, চির প্রিয় ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত।